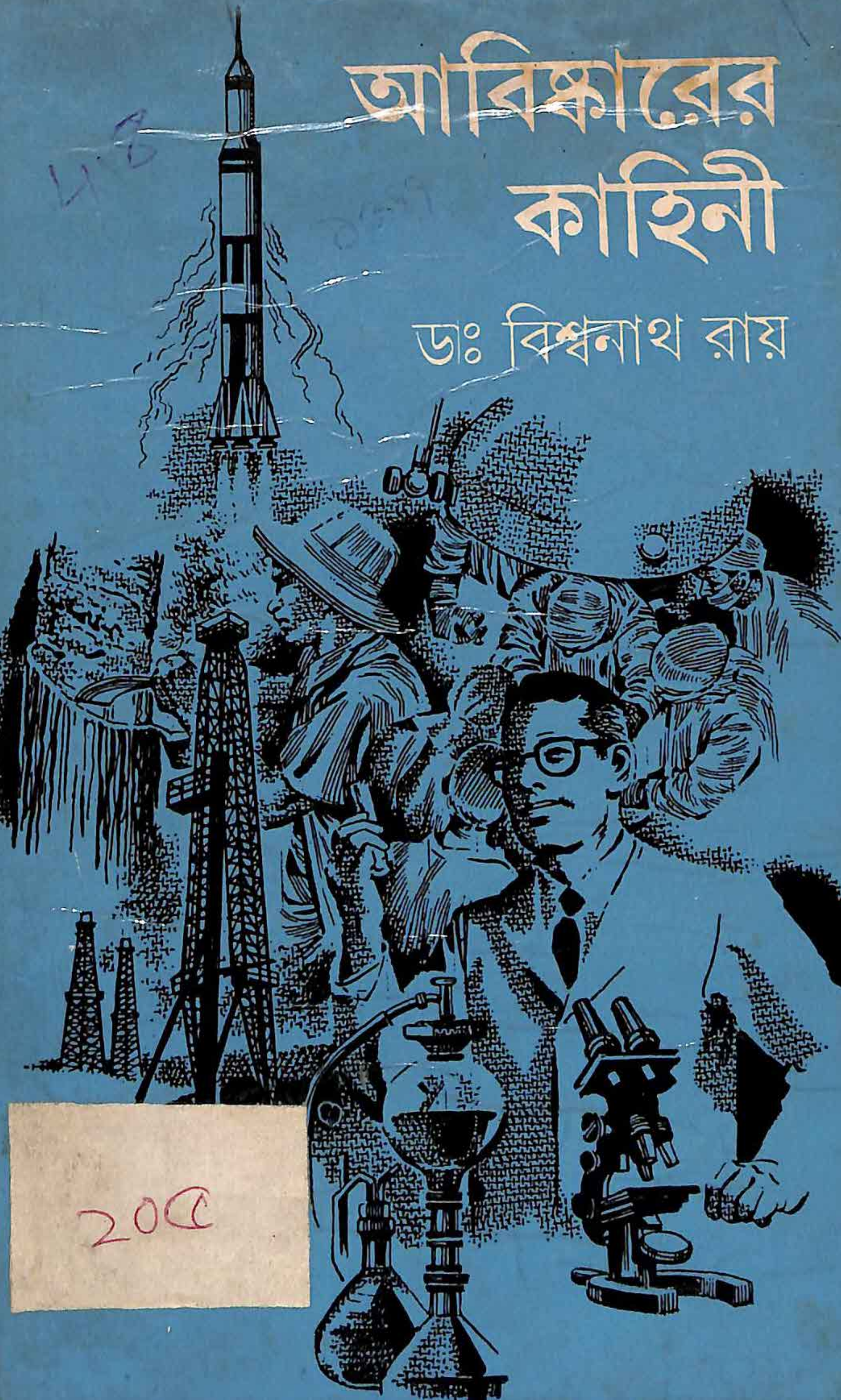
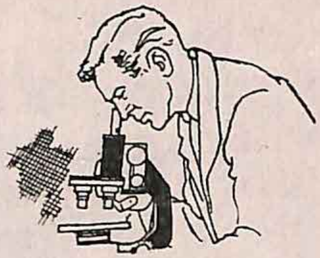
আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়



আবিষ্কারের কাহিনী





আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

সন্ধানী ॥ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৯, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

প্রকাশক : হরিগোপাল বসাক
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক : গৌর মান্না
করুণাময়ী প্রেস
৯/৭বি, পিয়ারীমোহন সুর লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বিমল দাস

দশ টাকা

বুতান ও দেশবিদেশের বালক বালিকা এবং
কিশোর কিশোরীদের হাতে।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

লেখকের নিবেদন

আবিষ্কারের কাহিনীর সামান্য ভূমিকা প্রয়োজন। এক একটি আবিষ্কারের পেছনে কত মনিষীর অক্লান্ত পরিশ্রম আছে, হয়ত কোন আবিষ্কার একজন বিজ্ঞানীর জীবনে শেষ হয়নি, হয়তো কোন বিজ্ঞানী সারা জীবন ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছেন, এর বিনিময়ে মানুষের কল্যাণের জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে কোন জীবনদায়ী ওষুধ, অথবা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি।

একটি আবিষ্কারের কাহিনী আমি গত পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন ছোটদের পত্রিকায় লিখেছি, তারই কয়েকটি সংকলিত করে আবিষ্কারের কাহিনী তৈরি হয়েছে। এই সংকলন প্রকাশের উদ্যম ও উৎসাহ অনুজপ্রতিম লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমান ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। পাঠক-পাঠিকার এ বই ভাল লাগলে, সবচেয়ে আনন্দিত হবে ষষ্ঠীপদ এবং সেই আনন্দই তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

বিভিন্ন গ্রন্থাবলী সাহায্য গ্রহণ করে, গল্পের আকারে, আবিষ্কারের কাহিনীগুলো লেখা হয়েছে। সেইসব গ্রন্থকারগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই। যথাসাধ্য ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে গল্পগুলি তৈরি করা হয়েছে, কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি, ঘটনাগুলিকে গল্পাকারে গড়ে তোলার জন্যে।

বইটি ভাল লাগলে আবার একটি সংকলন পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দেবার ইচ্ছে রইল।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

৭১এ, খেলাৎবাবু লেন
কলিকাতা সাত লক্ষ দুই



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ এক

একসময় মানুষ পশুর সঙ্গে বনে বাস করত। ইতিহাস-বিশেষজ্ঞরা সে যুগের নাম দিয়েছেন ক্রো-ম্যাগনন যুগ। তোমরা নিশ্চয়ই ইতিহাসে পড়েছ, মানুষ প্রস্তরযুগ, ধাতুর যুগ পার হয়ে তবে বর্তমান যুগের সূচনা করেছে। এই ক্রো-ম্যাগনন যুগ প্রস্তরযুগের অনেক হাজার বছর আগেকার কথা।

মানুষ আর পশু তখন একসঙ্গে বাস করত ব'লে অনেক মানুষ মারা পড়ত হিংস্র জন্তুর আক্রমণে। এক বন থেকে অন্য বনে প্রাণ ভয়ে পালাত তারা।

পশুর আক্রমণ ছাড়াও, প্রাকৃতিক বিপদ ঘটত মাঝে মাঝে। তোমরা জান মাঝে মাঝে বনে আগুন লাগে। গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে শুকনো পাতায়, গাছের কাণ্ডে আগুন ধরে যায়, শুকনো বনে দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বনজঙ্গলের এই আগুনকে বলা হয় দাবানল। যেখানে আগুন লাগে, পশুপাখিরা বনের সে অঞ্চল পরিত্যাগ করে অন্য অঞ্চলে গিয়ে নতুন বাসা বাঁধে। মানুষের দলও পশুপাখির সঙ্গে বন থেকে বনান্তরে পালিয়ে যেত বাঁচবার জন্যে। মানুষ ভাবত, ওই বিরাট আকারের প্রাণীটা আসলে কি বস্তু, যার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তার বা পশুপাখির দেহ ঝলসে যায়! আসলে মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে, কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। আগুন স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝলসে গেছে। তখনও যে পালিয়ে আসেনি তার মৃত্যু হয়েছে অবধারিত।

এইভাবে মানুষ যখন পশুপাখির সঙ্গে বনে বাস করছে, তখনই ইতিহাসবিদ্‌রা তাদের নাম দিয়েছেন ক্রো-ম্যাগনন বলে।

সাহস আর চিন্তা করার অঙ্কুর জন্মাল ক্রো-ম্যাগনন যুগের মানুষের মস্তিষ্কে। অনেক কাল এইভাবে কেটে গেছে, তারপর একদিন হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল।

পেছনে দাবানল। মানুষের দল ছুটে পালাচ্ছে অন্য বনে, হঠাৎ একটা জ্বলন্ত ডাল একটি লোকের সামনে ভেঙে পড়ল। সেই লোকটি ছিল অসাধারণ সাহসী আর শক্তিমান। সে সাহসভরে এগিয়ে গিয়ে ডালটির যে দিক জ্বলছে না, সেই দিক হাতে তুলে ধরল। দলের অন্য সকলে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্। লোকটি মশালের মত জ্বলন্ত ডালটিকে তুলে ধরে দেখতে লাগল, কই, আগুনতো এগিয়ে এসে কামড়াচ্ছে না!

কিছুক্ষণ জ্বলন্ত শিখার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটি, তারপর কী চিন্তা করে ডালের জ্বলন্ত দিকটা মাটিতে আছড়ে নিবিয়ে ফেলল। তারপর পোড়া ডালটি নিয়ে ছুটল দাবানলের দিকে।

দলের অন্যসকলে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার কাণ্ড-কারখানা দেখছে।

লোকটি হাতের পোড়া কাঠটা আবার দাবানলের আগুনে ধরল। কাঠ জ্বলে উঠল। সে আবার মাটিতে আছড়ে নিবিয়ে দিল, পরক্ষণেই আবার সেই কাঠে আগুন ধরাল। তারপর সেটা দাবানলের মধ্যে ফেলে দিল। এবার নতুন একটা বড় শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে, আগুনের মধ্যে এগিয়ে দিল ; কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে ধরা ডালটি জ্বলে উঠল। ডালটিকে কাঁধে নিয়ে দেখল ডালটি মশালের মত জ্বলছে আর অন্ধকারে তার পথ দেখার সুবিধে হচ্ছে। সে আবার ডালটি নিবিয়ে দিয়ে নতুন করে দাবানলের মধ্যে ধরল, আবার জ্বলে উঠল সেটা। ডালটি নিয়ে সে দলের দিকে ছুটল, এমন সময় নতুন একটা গাছে সেই জ্বলন্ত ডাল লেগে গিয়ে সেটাতেও

আগুন ধরে গেল। প্রথমে লোকটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, হাতের ডালটা মাটিতে ফেলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা নিবে গেল, গাছ কিন্তু জ্বলছে। লোকটা সাহস করে পোড়া ডালটাকে তুলে নিয়ে জ্বলন্ত গাছে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের ডাল জ্বলতে লাগল। সে দলের কাছে ছুটতে ছুটতে এগাছে ওগাছে আগুন ধরিয়ে দিলে। গাছগুলো পুড়তে লাগল। লোকটির মনে হল এই জীবকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় এবং সে এগিয়ে এসে কামড়ায় না।

এমন সময় একটা হিংস্র পশু তার দিকে ছুটে আসছিল। লোকটা নিরুপায় হয়ে হাতে ধরা জ্বলন্ত ডালটা জন্তুটার সামনে এগিয়ে দেয়। সামনে আগুন দেখে জন্তুটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল, তারপর দে-দৌড়।

লোকটি বীর সেনাপতির মত জ্বলন্ত ডাল নিয়ে দলের সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর দলকে অনুসরণ করতে বলে ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে অন্য বনে এসে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমি বেছে নিয়ে সেখানে নতুন দল বাঁধার ব্যবস্থা করল লোকটি। এবার আর শুধু বাস নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু বেশি। লোকটি সবাইকে বলল, শুকনো লতাপাতা ডাল জোগাড় করতে। যখন জোগাড় হল, তখন সে আদেশ দিল, শুকনো লতাপাতাগুলো গণ্ডির মত সাজিয়ে দিতে। সকলে সাজিয়ে দিল।

দলের সকলকে গণ্ডির মধ্যে নিয়ে লোকটি সেই জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে শুকনো গাছগাছড়ায় আগুন লাগিয়ে দিল।

সকলে সেই আগুনের গণ্ডির মধ্যে বসে রইল। যেই পাতা নিবু-নিবু হয়, লোকটি গণ্ডির বাইরে এসে নতুন শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আবার আগুনে ফেলে দেয়, গণ্ডির আগুন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে।

এইভাবে মানুষের দল আগুনের গণ্ডির মধ্যে বাস করতে লাগল। কেবল খাদ্য সংগ্রহের সময় গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসে দল বেঁধে।

সেই দুঃসাহসী লোকটি যায় জ্বলন্ত ডাল কাঁধে নিয়ে, চলাফেরা করে, কোন হিংস্র পশু এসে পড়লে লোকটি তার সামনে আগুন ধরে, অমনি সে ভয়ে পালায়।

বনের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের পর ডেরায় ফিরতে তাদের অসুবিধে হয় না। দূর থেকেই আগুনের গণ্ডি দেখা যায়। সেই আগুন লক্ষ্য করে এগোলেই আবার তারা পুরনো জায়গায় ফিরে আসে।

আগুনের গণ্ডির মধ্যে বাস করার সবচেয়ে বড় উপকার হল নিরাপত্তা। আগে হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ত, কিন্তু অগ্নিবলয় দেখে পশুরা আর কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না।

এইভাবে চলল অনেক দিন। যে লোকটি আগুনকে বাগে এনেছিল তাকেই সর্বশক্তিমান স্থির করে দলপতিরূপে চিহ্নিত করল দলের সবাই। এইভাবে মানুষের সমাজ পশুসমাজ থেকে পৃথক হয়ে গেল, এবং একজন নেতার সৃষ্টি হল।

অনেকদিন ধরে আগুনের বলয়ে মানুষ বাস করেছে, তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে সমস্ত আগুন নিবে গেল। সে সময় মানুষ আগুনের সাহায্য নিতে শিখেছিল, কিন্তু আগুন জ্বালাতে জানত না। অনেকদিন আগুন ছাড়াই মানুষকে বাঁচতে হয়েছিল, তখন আবার নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার পালা।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ গুহার আশ্রয় নিল। কিন্তু আগুন না পাওয়া পর্যন্ত তারা নিজেদের অসহায় ভাবতে লাগল।

একদিন একজন মানুষ বনের মধ্যে পাথর ছুঁড়ে ফল পাড়তে যায়, পাথরটা ফলে না লেগে দূরে মাটিতে আর একটা পাথরে ঠোক্কর মারে। ফলে চকমকির মতো ঘষা লেগে আগুন জ্বলে ওঠে। আশেপাশের শুকনো লতাপাতায় লেগে যায় সেই আগুন। লোকটা প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে ভাবে, মাটি ফুঁড়ে আগুন বেরিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ সভয়ে ছুটে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল। পরে দেখল, আগুন ক্রমশঃ নিবে আসছে, মাটি ফুঁড়েও বেরোচ্ছে না।

লোকটা অনেক শুকনো লতাপাতা জড়ো করে আগুনের ওপর রাখল। আগুন আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

লোকটা কিছুক্ষণ ধরে আগুন দেখতে লাগল, তারপর হঠাৎ কী খেয়াল হল, সে পাথরে পাথরে ঠুকতে লাগল। পাথরের ঘষায় আগুনের ঝিলিক।

লোকটা প্রথমে আঁৎকে উঠে পাথর ছুটো ফেলে দিল, কিন্তু আর কোন আগুন বার হল না দেখে সে আবার পাথরে পাথরে ঘষল। আবার আগুনের ঝলক। কয়েকবার জ্বালার পর, সে কিছু শুকনো পাতা জোগাড় করে, তার পাশেই পাথর ঘষতে লাগল। আগুনের ফুলকি পাতার মধ্যে ছড়িয়ে গেল আর পাতাগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

পাথরে পাথরে ঠুকে তাহলে আগুন ধরানো যায়। লোকটা পাথর ছুটো কাছে রেখে দিল এবং দলের কাছে ফিরে এসে গুহার সামনে শুকনো লতাপাতা সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল। সবাই অবাক মানল এবং একমত হয়ে চকমকিওলা লোকটিকেই দলপতি নির্বাচিত করল।

এই হল মানুষের প্রথম আবিষ্কার আগুন। দীর্ঘদিন কাটল, একদিন মানুষ লক্ষ্য করল বনের পশু শিকার করে, তার মাংস আগুনে ঝলসে খেলে আরও ভাল লাগে।

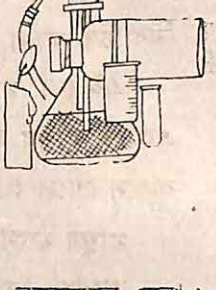
মানুষ মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখল।

আরও পরে একদল মানুষ একদিন বনে শিকার করতে বেরিয়েছে। একটি মেয়ের পায়ে হাড় ফুটে গেল। পা ফুলে বিষিয়ে গেল তার। দলপতি দলের একজনকে বলল, ও কি করে ভাল হয় দেখ।

এর আগে কারুর শরীর খারাপ হলে, সেই লোকটি গাছের লতাপাতা এনে তাকে খাইয়ে দিত। এবারেও তাই করল। কিন্তু কোনই সুরাহা হল না, মেয়েটির পা আরও ফুলে উঠল। অনেক ভেবেচিন্তে লোকটির মাথায় একটা উপায় এল। সে একটা পাথরের টুকরো খুব ধারালো করল, তারপর মেয়েটির পায়ের তলায় সবচেয়ে ফুলো জায়গায় ছুরির মত পাথরটা চালিয়ে দিল। পা কেটে গলগলিয়ে পূঁজ বেরিয়ে যাবার পর মেয়েটি সুস্থ বোধ করল।

এমনি ভাবেই মানুষের সমাজে তৈরি হল চিকিৎসক। চিকিৎসক আবার আবিষ্কার করে চলেছেন নতুন নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি।

আবিষ্কারের কাহিনী ॥ দুই



উত্তর ইতালীর স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহর। ছোট্ট শহর, বনজঙ্গলে ঘেরা। একটা পাগলামত ছেলে প্রায়ই বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। কোন সময়ে নিজের মনে প্রাণখুলে বেসুরো সুরে গান জুড়ে দিত, আবার কোন সময়ে নানারকম খেলায় মেতে থাকত।

ছেলেটির খেলা কিন্তু খুবই নিষ্ঠুর ধরনের। হয়ত ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে, খপ করে একটা ধরে ফেলল, তারপর একহাতে চেপে ধরে, অন্য হাত দিয়ে ডানাটা ছিঁড়ে ফেলল। ছেঁড়া ডানা আবার জোড়া লাগাবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন পারল না, তখন ছুড়ে ফেলে দিয়ে, আবার একটা ধরবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফড়িং দেখতে কেমন, বনের সবুজ কি সুন্দর। পাহাড়ের দিকে তাকালে মনে হয়, একটা ছবি দেখছি, এসব তার খেয়ালও হত না। সে শুধু জানতে চায়। কি জানতে চায় সে নিজেও জানে না।

এ কাহিনী আজকের নয়। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ছেলেটির জন্ম হয় স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহরে। তার নাম ল্যাজারো স্প্যালানজানি (Lazzaro Spallanzani)। স্প্যালানজানির বাবা ছিলেন স্ক্যাণ্ডিয়ানো শহরের একজন নামকরা উকিল। তাঁর মনের গোপন বাসনা ছিল, ছেলেও তাঁর মত উকিল হোক। ছেলেকে তিনি সেই মত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। স্কুলের ছুটি হলেই ল্যাজারো চলে যেত সেই জঙ্গলে। সেখানে বসে চুপচাপ নানান কথা ভাবত। প্রকৃতির আদি রহস্য সে উদ্ধার করবেই, এমনি একটা চিন্তা সব সময়েই খেলত। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবত, এগুলো এল কোত্থেকে! আগ্নেয়গিরিই বা হয় কি করে? ওই যে ঝরঝরিয়ে ঝরনাধারা ঝরছে, ওটাই বা হল কোত্থেকে?

একদিন ল্যাজারো সাহস করে তার বাবাকে বলল—বাবা, আমার সঙ্গে বনে বেড়াতে যাবে?

—চল। ছেলের আবদার রাখতে বাবাও বেরিয়ে পড়লেন বনের দিকে।

বনে এসে ল্যাজারো জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা বাবা, ওই যে ঝরনা, ওটা হল কোত্থেকে?

শিশুমনকে প্রবোধ দেবার জন্যেই ওর বাবা উত্তর দিলেন--রূপ-কথায় পড়োনি? আদিকালে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর মেয়েদের বনের

মধ্যে বন্দী করে রাখা হত, সেই সব মেয়েদের চোখের জল ঝরনা হয়ে বেরিয়ে আসত।

বাবার কথা শুনে ল্যাজারের হাসি পায়। সে মনে মনে ভাবে, বাবা তাকে ছোট ছেলে পেয়েছেন, যে আবোলতাবোল একটা কথা বলে দিলেই হল! মনে মনে একটু বিশ্বাস করল না, কিন্তু সাহস করে কিছু বললও না। চুপ করে থাকল।

ল্যাজারোর বাবা বুঝতে পারলেন, ছেলে এই গল্প শুনে সন্তুষ্ট নয়। অকালপক্ক ভেবে, ছেলেকে গম্ভীর হয়ে বললেন—আজেবাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কাল থেকেই পড়তে বসবে।

কোন কথা না বলে ল্যাজারো নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন থেকে বাবার কথামতই পড়তে বসে গেল। সে সকলকে দেখাতে লাগল আইন পড়তে তার খুব ভাল লাগে, কিন্তু গোপনে গোপনে সে গণিতশাস্ত্র, গ্রীক, ফরাসী ভাষা পড়ে নিল। লজিকও পড়তে লাগল। পড়াশুনার শেষে ছুটি পেলেই বনে গিয়ে বসে আর ভাবে এই গাছ, পাহাড়, ফুল, জীব এল কি করে? কে এইসব তৈরি করেছে?

এমন সময় একজনের সঙ্গে ল্যাজারোর দেখা হয়ে গেল।

একদিন ল্যাজারো বনের মধ্যে বসে প্রকৃতির আশ্চর্য ব্যাপারের কারণ খুঁজছিল, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখতে সৌম্য। একগাল পাকা দাড়িতে আরও সুন্দর লাগছিল। ভদ্রলোক ল্যাজারোকে দেখতে পেয়ে, গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

—ল্যাজারো। ল্যাজারো স্প্যালানজানি।

—ও, তোমার বাবা মিঃ স্প্যালানজানি? যিনি মস্তবড় উকিল। আচ্ছা! আমি তাঁকে খুব ভাল ভাবে চিনি।

ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ল্যাজারোর পাশে বসে আবার ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে একা একা কি করছ?

ল্যাজারো ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তাঁকে দেখে মনে হল, হয়ত তিনি উত্তর দিতেও পারেন। তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সামনের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ল্যাজারো জিজ্ঞাসা করল— আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন। ল্যাজারোর পাশে বসে মিষ্টিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি তোমার প্রশ্ন?

—আচ্ছা বলতে পারেন, এই যে বনে এত পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা এল কোত্থেকে? ওই যে ঝরনা, ওটাই বা হল কোত্থেকে?

—তোমার বাবা কি বলেন!

—তিনি এড়িয়ে যান।

—গির্জার পুরোহিত কি বলেছেন?

—তিনি বলেছেন, এ সব সৃষ্টি ঈশ্বর করেছেন।

—কথাটা বিশ্বাস করতে দোষ কি?

—কি করব বলুন? ল্যাজারো মাথা নেড়ে জবাব দিল—ও কথায় আমার মন সায় দেয় না। আমার মনে হয়, এর উত্তর কোথাও না কোথাও লুকোন আছে। তাই খুঁজতে এখানে এসে বসে থাকি।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি পড়?

—আইন!

—কেন? আইন কেন?

—কি করব? বাবা যে আইন ছাড়া কিছু পড়তে দিতে চান না।

ভদ্রলোক একবার ল্যাজারোর দিকে তাকিয়ে বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

বিহ্বল ল্যাজারো ভদ্রলোকের পিছু পিছু গাড়িতে গিয়ে উঠল।

বাড়িতে ঢুকতেই ল্যাজারোর বাবা আগন্তককে দেখে বিস্মিত হলেন এবং সশ্রদ্ধকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

ল্যাজারো আরও ঘাবড়ে গেল। ভদ্রলোকের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল একবার।

ভদ্রলোক ল্যাজারোর বাবাকে গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমার কাছে এসেছি তোমার ছেলের বিষয়ে কথা বলতে।

ল্যাজারোর বাবা হাতজোড় করে বললেন—আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। ও সব সময়ে এমন পাকা পাকা কথা জিজ্ঞেস করে যে পিত্তি জ্বলে যায়। ছেলেমানুষ ভেবে ওকে ক্ষমা করুন মিঃ ভ্যালিসনীয়ারি (Vallisnieri)।

ল্যাজারো ভয়ে শুকিয়ে গেল। বিজ্ঞানী ভ্যালিসনীয়ারির নাম তখন ইটালীর সকলেই জানে। প্রত্যেকে ওই নামটিকে পরম শ্রদ্ধা করে। ল্যাজারো কি করবে ভেবে পেল না।

ভ্যালিসনীয়ারি ল্যাজারোর দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি একটু এখান থেকে যাও। তোমার বাবার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা আছে।

ল্যাজারো একটি কথাও না বলে ঘর থেকে বিদায় নিল।

ল্যাজারো ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ভ্যালিসনীয়ারি ল্যাজারোর বাবাকে বললেন—এ ভাবে ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছ কেন?

কথাটার অর্থ ঠিক ভাবে ধরতে না পেরে, ল্যাজারোর বাবা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তোমার ছেলে একজন বৈজ্ঞানিক। ওকে এভাবে আইন পড়িয়ে সময় নষ্ট করাচ্ছো কেন?

—ও পারবে ওই সব জটিল তত্ত্বের কথা বুঝতে?

—পারবে। দৃঢ়কণ্ঠে ভ্যালিসনীয়ারি জবাব দিলেন—আমি ওর

প্রশ্ন শুনেছি। একমাত্র বৈজ্ঞানিকের মন না হলে, এসব প্রশ্ন মনে জাগে না।

—আপনি বলছেন ?

—আমি বলছি স্প্যালানজানি, তোমার ছেলেকে বিজ্ঞান পড়তে দাও। দেখবে, একদিন ও সারা স্ক্যাণ্ডিয়ানোর গর্ব হয়ে উঠবে। তোমার ছেলে গ্যালিলিওর মত বৈজ্ঞানিক হবে !

—বেশ। আপনি যখন বলছেন, তাই হবে।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির জীবনগতি বদলে গেল। যে ছেলে আইন পড়ছিল, সে রেগিও ইউনিভারসিটিতে বিজ্ঞান পড়তে চলে গেল। বদ্ধ স্ক্যাণ্ডিয়ানো থেকে উন্মুক্ত ইওরোপীয় সভ্যতার মধ্যে এসে পড়ল। চোখ চেয়ে ল্যাজারো চারদিকের সমাজ দেখতে পেল। ইওরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সে সময়ে একটা বিপ্লব চলেছে। একদল সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী বলে চলেছে, ঈশ্বরই সব। ঈশ্বর ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই থাকত না, কিছুই থাকবে না। এত মতবাদ ধর্মযাজকেরাই বেশী প্রচার করতেন। বিপরীত দলের লোকেরা বলতেন—ও সব বুজরুকি ! আসলে গির্জায় ক্ষমতা আটকে রাখার জন্যেই এই সব ভাঁওতা দিয়ে সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে।

এই ধরনের মতবাদ যখন সারা ইওরোপে, তখন ল্যাজারো নিজের সাধনায় মগ্ন। লিউএনহক আবিষ্কৃত মাইক্রোস্কোপ নিয়ে ল্যাজারো দিনরাত বসে আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে অনেক রকমের জীবাণু দেখতে পায় সে। এটা নতুন কিছু নয়। লিউএনহক নিজেই বলে গেছেন, জলে জীবাণু আছে। কিন্তু এইসব জীবাণু আসছে কোত্থেকে ? এ প্রশ্নের উত্তর লিউএনহক দিতে পারেন নি। অবশ্য দেবার আগেই মৃত্যু তাঁকে ডেকে নেয়। ল্যাজারো নিজের ল্যাবোরেটরীতে অস্থিরভাবে কাজ করে আর ভাবে, কই কোথাও তো কিছু পাচ্ছি না ! তাহলে কি ভগবান পৃথিবীর প্রথম ছয় দিনে মানুষ,

জীবজন্তু সৃষ্টি করেছিলেন ? ভগবান কি তাহলে পৃথিবীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ?

অস্থিরভাবে কাজ করে, আর এইসব কথা ভাবে। হঠাৎ একদিন রাতে একটি বই পেল ল্যাজারো, আর সেই বই পড়ে চোখ খুলে গেল। বইটি লিখেছেন রেডি (Redi) নামক জনৈক অখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি বইতে বলেছেন, মাছি জাতীয় পোকার মা বাবা আছে। তিনি দুটো কাঁচের জারে খানিকটা করে মাংস ভরে একটি জারে ঢাকনা দিয়ে দিলেন, অপরটি খোলা রইল। খোলা জার দিয়ে মাছি, ম্যাগট প্রভৃতি পোকা যাতায়াত করতে লাগল। বন্ধ জারে কিছুই যাতায়াত করতে পারল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল খোলা জারগুলিতে মাছি জন্মেছে, কিন্তু বন্ধ জারগুলোতে কিছুই জন্মায় নি।

ল্যাজারো বইটা পড়ে বলল—রেডি আমার গুরু। তিনি আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি বলছি, মাছির মত জীবাণুদেরও বাবা মা আছে। তারা আকাশ থেকে সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করেন নি। তাদের নিশ্চয়ই একটা বংশের ধারা আছে।

ঠিক সেই সময়ে নিড্হ্যাম নামে একজন গোঁড়া ক্যাথলিক ভদ্রলোক ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। নিড্হ্যাম পরীক্ষা করে দেখেছেন জীবাণুগুলো মাংসের রস থেকে তৈরী হয়। তিনি খানিকটা মাংস গরম অবস্থায় উনুন থেকে নামিয়ে জারের মধ্যে পুরে, জারের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। জারটিকে আগে ভাল করে গরম করে নিয়েছিলেন, যাতে কোন রকমের জীবাণু বাঁচতে না পারে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল জারের মধ্যে মাংসের ওপর জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে। নিড্হ্যাম ঘোষণা করলেন, মাংসের জুস (juice) থেকে জীবাণু সৃষ্টি হয়। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং কাগজে সেই পরীক্ষার ফল নিয়ে আলোড়ন শুরু হল।

রয়্যাল সোসাইটি এবং ইওরোপের শিক্ষিত সমাজ নিড্হ্যামের পরীক্ষা নিয়ে রীতিমত আলোচনা শুরু করে দিলেন। এ তো আর গল্পকথা নয়। রীতিমত পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেওয়া। মাংসের রস থেকে জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর আছেন।

ইটালীতে বসে ল্যাজারো নিড্হ্যামের পরীক্ষা পড়ল। পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল। অবিশ্বাসের ঢেউ মনের মধ্যে খেলা করে গেল। স্ক্যাণ্ডিয়ানোর বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝরনার বিষয় বাবার কাছ থেকে কৈফিয়ত শুনে মন যে রকম অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি অবিশ্বাসী হয়ে উঠল।

—বাজে কথা! নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে ল্যাজারো বলল—মাংস থেকে, কি বাদাম থেকে, কি ঈশ্বর থেকে জীবাণু সৃষ্টি হয়, সব বাজে কথা। এই পরীক্ষার মধ্যে কোথাও একটা বিরাট ফাঁক আছে।

ল্যাজারো সোজা হয়ে বসল। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ণ করে তুলল। নিড্হ্যামকে মনের মত জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

ল্যাবরেটরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ল্যাজারো অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল টেনে ভাবতে লাগল, কি করে গরম মাংসতে জীবাণু তৈরী হল?

হয় নিড্হ্যাম ভাল করে মাংস সেদ্ধ করে নি, আর নইলে জারের ছিপি ভাল করে আটকায় নি। আচ্ছা, ব্যাপারটা দেখা যাক।

এই প্রথম ল্যাজারো সত্যিকারের আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করল। এর আগে সে শুধু অন্য জ্ঞানী গুণীর বিশ্বাস এবং পরীক্ষার ফলকে নাকচ করেই ক্ষান্ত হত। এবার আর নিড্হ্যামকে কোন কথা লিখল না। তার বদলে, জামার হাত গুটিয়ে, শান্ত মনে, কাজের টেবিলে বসে পড়ল।

নিড্হ্যামের মতই ল্যাজারো মাংসের রস যোগাড় করল, তারপর

জারে পুরে ফোটাতে লাগল। নিড্‌হ্যাম নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ গরম করে নি। কোন কোন জীবাণু বা পোকার ডিম গরমে বাঁচে। দেখা যাক।

পুরো একঘণ্টা ল্যাজারো জারটিকে সেদ্ধ করল। তারপর জারের মুখের দিকটা আগুনে গলিয়ে পুরো সীল করে দিল। নিজের মনেই বলল—ছিপি দিলে কোথাও ফাঁক থেকে যেতে পারে।

জারটিকে ঠাণ্ডা করতে দিয়ে ল্যাজারো ল্যাবোরেটরী থেকে বেরিয়ে গেল সময় কাটাবার জন্য। দুদিন পরে ফিরে এসে দেখল, জারে একটিও জীবাণু জন্মায় নি।

পরদিনই ল্যাজারো ঘোষণা করল, নিড্‌হ্যামের ধারণা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আসলে উনি জারগুলোকে ভাল করে সেদ্ধ করেন নি, আর জারের মুখগুলোকে ভাল করে লাগান নি। ফলে বাইরের হাওয়া থেকে জীবাণু জারের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

নিড্‌হ্যাম তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন, ল্যাজারো একঘণ্টা ধরে ফুটিয়েছে, তার ফলে ঈশ্বরের যে শক্তি ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে।

নিড্‌হ্যামের রিপোর্ট পড়ে ল্যাজারো ক্ষেপে উঠল। সে নিজের মনেই বলল—আচ্ছা! এবার মজা দেখাচ্ছি। ভেজিটেটিভ্ ফোর্স সত্যি কিনা এবার হাতে হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

ল্যাজারো পর পর অনেকগুলো জার তৈরি করল। অর্ধেকগুলোতে নিড্‌হ্যামের মত ফ্লাস্কের ছিপি এঁটে বন্ধ করল, বাকী অর্ধেক নিজের পদ্ধতিতে গরম করে কাঁচের মুখ গলিয়ে সীল করে দিল। তারপর পর পর সাজিয়ে ফেলল জারগুলো। প্রত্যেকটি গরম করতে শুরু করে দিল। দশ মিনিট থেকে আরম্ভ করে, দুঘণ্টা পর্যন্ত গরম করল জারগুলো। তারপর ঠাণ্ডা করতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন ফিরে এসে জারগুলোকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। পরীক্ষা করতে করতে মুখে জয়ের

হাসি ফুটে উঠল। গর্বের সঙ্গে বলল—নিড্‌হ্যাম তোমার চিন্তা সম্পূর্ণ মিথ্যে!

ল্যাজারো তার পরীক্ষায় প্রমাণ করল, দশ মিনিট বা দুঘণ্টায় কোন আলাদা ফল ফলছে না। যে জারের মাংসের রস দশ মিনিট ফোটানো হয়েছে, অথচ কাঁচ গলিয়ে মুখ সীল করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে জীবাণুর চিহ্ন নেই, আবার যে জারগুলি দুঘণ্টা গরম করা হয়েছে, কিন্তু ছিপি এঁটে মুখ বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলিতে জীবাণুর আবির্ভাব হয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণ হচ্ছে! নিড্‌হ্যামের কথানুযায়ী ভেজিটেটিভ্ ফোর্স-এর জোরে মাংস থেকে জীবাণু তৈরী হচ্ছে। একথা ভুল। আসলে জীবাণু আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই তারা বংশবৃদ্ধি করছে। কাঁচের মুখ গলিয়ে বন্ধ করে দেবার জন্যে জারে ঢোকবার পথ না পেয়ে তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে নি। ছিপি এঁটে দেবার জন্যে হাওয়া ঢুকেছে এবং তাতে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করেছে।

ল্যাজারোর পরীক্ষা ক্রমশঃ সারা ইওরোপে সাড়া জাগিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে দুটো মতের লোক তৈরী হয়ে গেল। একপক্ষ ল্যাজারোকে সমর্থন জানাল, অন্যপক্ষ নিড্‌হ্যামের দিকে গেল।

নিড্‌হ্যামও চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনিও জানালেন ল্যাজারোর পরীক্ষা ঠিক নয়। আমি বলছি ঈশ্বরের শক্তি আছে। তা আমরা হয়ত দেখতে পাই না বা বুঝতে পারি না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। তা যদি না থাকত, তাহলে সেদ্ধ মাংসরস থেকে কী করে জীবাণু সৃষ্টি হয়!

ল্যাজারো দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল অক্সিজেনের জন্য!

—অক্সিজেন! বাতাস! সেটা বোতলের মধ্যে ঢুকছে কিনা তার প্রমাণ আছে?

এবার থমকে গেল ল্যাজরো। সত্যিই তো! বাতাস বোতলে

ঢুকছে এটা ভেবে নেওয়াই হয়েছিল কিন্তু কোন পরীক্ষায় প্রমাণ হয় নি। ল্যাজারো গম্ভীরভাবে জবাব দিল—প্রমাণ আমার হাতে নেই, তবে শীঘ্রই দিতে পারব।

আবার ল্যাবোরেটরী। আবার অস্থিরভাবে পায়চারি। ল্যাজারো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো। কীভাবে—কীভাবে প্রমাণ করা যায় বাতাস বোতলের মধ্যে ঢুকছে? ঢুকছে, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। নিড্‌হ্যামের ঈশ্বর বিশ্বাসের চেয়েও জোরাল বিশ্বাস আমার। কিন্তু—কিন্তু—।

ভাবতে ভাবতে একদিন অন্যমনস্কভাবে একটা জার কানের ওপর চেপে ধরেই শুনতে পেল সোঁ সোঁ শব্দ। অবাক্ হয়ে আবার কানে চেপে ধরল, আবার সেই শব্দ। একটা জার ফাটিয়ে ফাটা জারটা কানে চেপে ধরতে আবার সেই সোঁ সোঁ শব্দ। আনন্দে ল্যাজারোর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই বাতাসের শব্দ। বাতাস বোতলের মধ্য থেকে কানে ধাক্কা মারছে আবার বোতলে ফিরে যাচ্ছে, তাই এই শব্দ। কিন্তু বোতলে ঢুকছে কিনা তার প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ অতি সামান্য একটা পরীক্ষা করেই পাওয়া গেল। আজকের দিনে আমরা বলতে পারছি সহজ পরীক্ষা, কিন্তু সে যুগে বলা এত সহজ ছিল না। সে যুগের লোক বিজ্ঞান বিশ্বাসই করত না। বিজ্ঞানের কথা কিছু বলতে গেলে নাস্তিক বলে মেরে ফেলা হত। সেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একা ল্যাজারো লড়াই করে চলেছিল। তার পরীক্ষা যদি মিথ্যে হয়, মৃত্যুই হবে একমাত্র শাস্তি।

ল্যাজারো একদিন একটা প্রদীপের শিখার দিকে তাকিয়ে দেখল শিখাটা নড়ছে। রোজই নড়ে, রোজই ল্যাজারো দেখে, কিন্তু সেদিনের দেখার মধ্যে যেন কিছু বিশেষত্ব ছিল। ল্যাজারো লক্ষ্য করল শিখাটা নড়ছে তার কারণ বাতাস যাতায়াত করছে।

বোতলের মুখে অমনি একটা শিখা ধরলেই বাতাস বোতল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কি বোতলে ঢুকছে। স্প্যালানজানি ল্যাজারো বোতলের মুখে শিখাটা ধরতেই মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিখা বোতলের ভেতরের দিকে যাচ্ছে।

এরপর নিড্হ্যামের বলার কিছু রইল না। ল্যাজারোর জয় সর্বত্র। ল্যাজারো স্প্যালানজানির নাম সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ল। ল্যাজারো স্প্যালালজানি প্রমাণ করে দেখলেন, পৃথিবীর যত জীবন, জীবন থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের জীবনই হোক আর জীবাণুই হোক। আমাদের মতই জীবাণুর জীবনেও জন্ম-মৃত্যু আছে। বয়স আছে। তাদের আলাদা সংসার আছে। এই জীবাণু আবার সব এক নয়। কোনটা বিন্দুর মন দেখতে, কোনটা দাঁড়ির মত, কোনটা আবার পাকানো পাকানো। বিন্দু জীবাণু থেকে বিন্দু জীবাণু সৃষ্টি হয়। লম্বা থেকে লম্বা জীবাণু হয়, আবার পাকানো থেকে পাকানো জীবাণু হয়। বিন্দু থেকে লম্বা বা লম্বা থেকে পাকানো জীবাণু কখনও হয় না।

ল্যাজারোর নাম ছড়িয়ে পড়তে নানাদিক থেকে অভিনন্দনপত্র আসতে লাগল। অস্ট্রিয়ার রাণী ম্যারিয়া থেরেসা ল্যাজারোকে একটি চিঠি লিখে জানালেন, তিনি যদি লোম্বার্ডি (Lombardy) নগরের প্যাভিয়া ইউভারনিসিটির ন্যাচারাল হিস্ট্রির অধ্যাপকের পদ নেন, তাহলে খুব ভাল হয়। প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি অতি প্রাচীন, কিন্তু ভাল অধ্যাপনার অভাবে, একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া ন্যাচারাল হিস্ট্রি ক্যাবিনেটের একটি অতি প্রাচীন মিউজিয়াম আছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যদি ল্যাজারো নেন, খুব ভাল হয়।

ল্যাজারো সেই পদ গ্রহণ করলেন।

ছাত্রদের তিনি এমনভাবে পড়াতেন, যে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকত না। দেখতে দেখতে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি আবার জমজমাট হয়ে উঠল। প্যাভিয়া ইউনিভার-

সিটিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ল্যাজারো কিছুদিনের জন্যে দেশভ্রমণে বার হলেন, আর সেই দেশভ্রমণই কাল হল।

ল্যাজারো যখন দেশে দেশে নিজের মতবাদ প্রচার করছিলেন তখন স্ক্যাণ্ডিয়ানোতে ক্যানন ভল্‌টা নামের একটি লোক এক ষড়যন্ত্র স্থষ্টি করেছিল। ল্যাজারোর নিজস্ব একটা মিউজিয়াম ছিল স্ক্যাণ্ডিয়ানোর বাড়িতে। ভল্‌টা সেই মিউজিয়ামের তুষ্প্রাপ্য জিনিসে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটির ছাপ গোপনে লাগিয়ে দিয়ে প্রচার করে দিল, এইসব জিনিস প্যাভিয়া ইউনিভারসিটি থেকে চুরি করে এনে ল্যাজারো সাজিয়েছে।

ল্যাজারোকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হল।

ভগ্নহৃদয় ল্যাজারো দেশভ্রমণ বাতিল রেখে ফিরে এলেন প্যাভিয়াতে। মাথা হেঁট করে প্যাভিয়া ইউনিভারসিটিতে ঢুকলেন। একদিন যেখানে মাথা উঁচু করে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়েছেন, আজ সেখানে চোরের অপবাদ নিয়ে ঢুকছেন।

ল্যাজারো ইউনিভারসিটিতে ঢুকে দেখতে পেলেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ছলছল চোখে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ল্যাজারোর মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এইসব ছেলেমেয়েদের ভালবাসাই তাঁর একমাত্র পাথেয়। অধ্যাপকের সবচেয়ে বড় সম্পদ্‌!

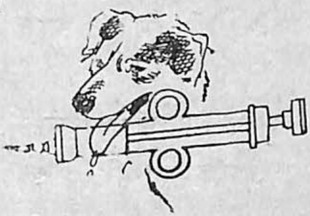
বিচার শুরু হল।

ল্যাজারো ক্ষিপ্ত বাঘের মত নিজের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উন্নত করে তুলেছেন তিনি। প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। তিনি নিজে প্যাভিয়ার মিউজিয়ামকে কত জিনিস দান করেছেন, খোঁজ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। আমার নিজস্ব মিউজিয়ামে যে সব জিনিস আছে, সেগুলি প্যাভিয়াতে যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই ছিল, তাছাড়া তার অনেকগুলো আমি নিজে প্যাভিয়াতেও তৈরি করেছি। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই।

ল্যাজারো বিদায় নিলেন। বিচারে তিনি নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন। কিন্তু শরীর আর মন সারল না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সন্ন্যাস রোগ হল, আর সেই রোগেই তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

ঠিক সেই বছরেই নেপোলিয়ন পৃথিবীকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার অভিযান শুরু করেছিলেন।

ল্যাজারো স্প্যালানজানির নাম যতদিন চিকিৎসাশাস্ত্র থাকবে, ততদিন সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে। স্প্যালানজানি মানুষের কুসংস্কারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রথম প্রণাম করলেন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জীবাণুদের জীবনকথা। আজকের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল ও আদি তত্ত্ব।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ তিন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই।

সকলে ধরাধরি করে জোসেফকে ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারিতে শুইয়ে দিল। ন বছরের ছেলে জোসেফ, তাকে পাগলা কুকুরে কামড়েছে। জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণগুলো জোসেফের দেহে ফুটে

উঠছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ; এ মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। কোনদিন এই মৃত্যুরোগ থেকে কেউ নিস্তার পায় নি।

জোসেফ মীস্টার (Josheph Meister) বাপের একমাত্র সন্তান। আলাস্তিয়া থেকে প্যারী নগরে এসেছেন ভাগ্যের অন্বেষণে। জোসেফ তাঁর নয়নের মণি, সে যদি মারা যায়, তাহলে তিনিও আত্মহত্যা করবেন।

জোসেফের মা ডাক্তারবাবুর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন—ডাক্তারবাবু, আমার ওই একটিমাত্র সন্তান। ওকে বাঁচিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু পাথরের মত নিস্পন্দ, নিথর। জলাতঙ্ক,—হাইড্রোফোবিয়া। শিবের অসাধ্য এই রোগ। মানুষের হাতে এমন কোন ওষুধ নেই, যাতে এই রোগ নিরাময় করা যেতে পারে।

—আমার কাছে এ রোগের কোন ওষুধ নেই। ডাক্তারবাবু ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন।

জোসেফের বাবা অস্থির হয়ে বললেন—যত টাকা চান দেব ; আপনি চেষ্টা করুন।

ডাক্তারবাবুর ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত। তিনি একটু বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন—জীবনে অর্থের লোভে কিছুই করি নি। আজ আমাকে টাকার লোভ দেখানো বৃথা।

জোসেফের মা ডাক্তারবাবুর পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমার ছেলে কি পশুর চেয়েও অধম ? শুনেছি আপনি পশুর জলাতঙ্ক রোগ সারিয়ে দিয়েছেন।

সত্যিই ! ডাক্তারবাবুর মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তিনি ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ভেড়া আর গরুর ওপর পরীক্ষা করেছেন। পঁচিশটি ভেড়া আর ছটি গরুকে তিনি তাঁর তৈরি ওষুধ ইনজেকশন দিয়েছেন। বাকিগুলোকে কোন ইনজেকশন দেন নি। তারপর জলাতঙ্ক সমস্ত পশুগুলোকে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু অ্যান্থ্রাক্স

ব্যাসিলি ইনজেকশন দিয়েছেন। যেগুলোকে প্রতিষেধক ইনজেকশন দিয়েছিলেন সেগুলোর কিছু হয় নি, কিন্তু যে পঁচিশটি ভেড়া আর ছটি গরু, কোন প্রতিষেধক ইনজেকশন পায় নি, তার সবকটিই জলাতঙ্ক রোগে মারা গেছে।

—কি হল ? ডাক্তারবাবু—কথা বলছেন না কেন ? জোসেফের মা আর্তকণ্ঠে বললেন—জোসেফের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু জোসেফের দিকে তাকালেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর করাল ছায়া ক্রমশঃ জোসেফের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে। ফরসা রঙের ওপর নীলাভ ছাপ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। নিঃশ্বাস টেনে টেনে নিচ্ছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠছে মাঝে মাঝে।

আপনার ছেলে পশুর অধম নয়, কিন্তু—

থেমে গেলেন ডাক্তারবাবু। যে ওষুধ তিনি তৈরি করেছেন, শুধু পশুর ওপরই তার প্রয়োগ হয়েছে। মানুষের ওপর কোনদিন তার ফলাফল দেখা হয় নি।

—কিন্তু কি ?—জোসেফের বাবা পকেট থেকে টাকার গোছা বার করে বললেন—টাকার জন্যে ভাবছেন ? আমরা সর্বস্ব উজাড় করে দেব। আপনি আর দেরি করবেন না। আমার ছেলেকে বাঁচান।
—টাকার দরকার নেই, কিন্তু যে ওষুধ কোনদিন মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয় নি, সেই ওষুধ সর্বপ্রথম আপনার ছেলে পাবে। মৃত্যু ঘটলে আমাকে কিছু বলতে পারবেন না।

—আমার ছেলে এমনিও মারা যাবে। তবু সান্ত্বনা থাকবে মৃত্যুর আগে আপনার মত চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করাতে পেরেছি।

—বেশ। তাহলে তাই হোক। ডাক্তারবাবু ধীরপায়ে আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাল্লা দুটো খুলে ফেললেন।

নিজের তৈরি ওষুধ বার করে সিরিঞ্জে ভরলেন, তারপর জোসেফের হাতে ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

দর্শকের দল সবাই নির্বাক। কি ঘটবে কেউ জানে না। ডাক্তারবাবুর তেষট্টি বছরের মধ্যে এই প্রথম মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছেন পশুর জন্যে তৈরি ওষুধ। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চিন্তান্বিত অবস্থায় জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছেন। এর পূর্বে তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করে যশের অধিকারী হয়েছেন, কিন্তু এমন কঠিন পরীক্ষার সামনে কোনদিন পড়েন নি।

টিক্ টিক্ টিক্ টিক্।

ক্রমশঃ নাড়ীর গতিবেগ উন্নত হচ্ছে। মুখের নীলাভ আভা দূরে সরে যাচ্ছে। যন্ত্রণার চিৎকার ধীরে ধীরে কমে আসছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

মৃত্যুকে বোধহয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তারবাবু বার বার নাড়ী টিপছেন জোসেফের। তাঁর মনের মধ্যে উত্তেজনা। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, অবধারিত মৃত্যুকে তিনি রোধ করে একটি মানবশিশুকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

—আপনার ছেলে এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

ডাক্তারবাবু কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন। জোসেফের বাবা কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন—আপনার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়, তবু বলুন আমরা কি করতে পারি?

ডাক্তারবাবু বললেন—সত্যিই যদি কিছু করার ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে এমন করুন যাতে আপনার ছেলের মতই আরও অনেক ছেলে বাঁচতে পারে।

—তাই হবে।

জোসেফকে সুস্থ করে ওর মা বাবা বাড়ি ফিরলেন। জোসেফের আরোগ্য সংবাদ লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। পৃথিবীর সর্বত্র রটে গেল এই খবর। দূর দূরান্ত থেকে পাগলা কুকুর আর

পাগলা নেকড়ে বাঘের কামড়ের রোগী আসতে লাগল ডাক্তার-বাবুর কাছে। জোসেফের বাবা এবং আরও বহু উপকৃত মানুষ চাঁদা তুলে প্যারিস শহরে একটি ইনস্টিটিউট তৈরি করে দিলেন, যেখানে জলাতঙ্ক রোগের ওষুধ তৈরি হবে, রোগীদের চিকিৎসা করা হবে এবং আরও নানারকম প্রতিষেধক ওষুধের গবেষণা করা হবে।

ইনস্টিটিউটটির নামকরণ হল চিকিৎসকের নামে, তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্যে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভাধর চিকিৎসকের নাম লুই পাস্তুর। ইনস্টিটিউটের নাম হল পাস্তুর ইনস্টিটিউট।

লুই পাস্তুর ফ্রান্সের ডোলে গ্রামে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। পাস্তুরের বাবা চামড়া ব্যবসায় করতেন, আর নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন সৈনিক ছিলেন। লুই পাস্তুর বাবার কাছে ফরাসীদেশের গল্প শুনে নিজে আশ্চর্য রকমের দেশপ্রেমিক হয়ে উঠেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই পাস্তুর বিজ্ঞানের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন বিজ্ঞানের চর্চার ভেতর দিয়েই দেশের সেবা করবেন।

নর্মাল স্কুল থেকে পাস করে পাস্তুর প্যারিসের একটি হাই-স্কুলের শিক্ষক হলেন। এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কন্যাকে পাস্তুর বিবাহ করেন।

তিনি স্কুলে কাজ করার সময় থেকেই বিজ্ঞানবিষয়ক নানা রিসার্চ করেন। তাঁর রসায়নশাস্ত্রের রিসার্চএর খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং কিছুদিনের মধ্যেই লিলি ইউনিভারসিটির কেমিস্ট্রির অধ্যাপক পদে উন্নীত হলেন। লিলি ইউনিভারসিটি তখন সবে গড়ে উঠেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করলেন দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যদি কোন বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যার উদয় হয়, তাহলে সেই সমস্যা বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রহণ করবে এবং তার সমাধানের চেষ্টা করবে। এই ধরনের

পরিকল্পনা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করেছে।

পাস্তুরকে ফরাসী সরকার অনুরোধ করলেন—অরলিয়ান্স অঞ্চলের অধিকাংশ মদের ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কিছুদিনের মধ্যেই সব মদ পচে যাচ্ছে। যদি লুই পাস্তুর এ সম্বন্ধে একটু গবেষণা করে সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তাহলে দেশের মদ তৈরির শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাঁচতে পারে।

পাস্তুর কোন জবাব দিলেন না, নীরবে সমস্যার কথা ভাবতে লাগলেন। পাস্তুরের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন, মদের মধ্যে একরকম রসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, যার ফলে মদ এই রকম টক হয়ে যায়, আর পচে যায়।

প্রফেসর পাস্তুর কী করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। এমন সময় একদিন তাঁর এক ছাত্র বিগো এসে হাজির হল।

—স্যার। আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিগো প্রায় কেঁদে ফেলল লুই পাস্তুরের সামনে।

—কি হয়েছে? স্নেহমেশানো কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলেন লুই পাস্তুর।

—আমার বাবার ফ্যাক্টরীতে যত বীয়ার (এক রকমের মদ) তৈরি হয়েছিল সব পচে গেছে। বাবা পথের ভিখিরী হয়ে গেছেন।

—হুঁ। ছাত্রের দুঃখে বিগলিত হয়ে পড়লেন আদর্শ অধ্যাপক।

—স্যার। এ বিপদ থেকে আপনি ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আপনি আমাদের দয়া করুন।

বিগোর কান্নায় বিচলিত লুই পাস্তুর। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—না, না, এ দয়ার কথা নয় বিগো। এ আমার কর্তব্য। প্রথমতঃ আমার ছাত্রের সর্বনাশ যাতে না হয় তার চেষ্টা করব। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী দেশের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। তুমি বাড়ি যাও, আমি কাল সকালে তোমাদের বাড়ি যাব।

বিগো ফিরে গেল। প্রফেসর পাস্তুর নিজের ল্যাবোরেটরীতে বসে চিন্তা করতে লাগলেন কেন এই মদের মধ্যে পচন ধরছে? কিসের জন্যে? কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন্? কি ধরনের রিঅ্যাকশন্?

নানারকমের চিন্তা করতে করতে রাত শেষ হয়ে গেল। সে রাতে পাস্তুরের চোখে ঘুম এল না। পরদিন ভোরবেলায় অরলিয়ান্স যাত্রা করলেন লুই পাস্তুর। বিগোর বাবা অধীর আগ্রহে পাস্তুরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পাস্তুরকে দেখতে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলেন। কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন বিগো ফ্যামিলি ভেবে পেলেন না।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। চল! তোমাদের ফ্যাক্টরী দেখে আসি।

—আগে গরীবের ঘরে কিছু জলযোগ করে বিশ্রাম করুন, তারপর ফ্যাক্টরী দেখতে যাবেন। বিগোর বাবা অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন।

—লুই পাস্তুর বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। প্রফেসর হাসতে হাসতে বললেন—আমি জলযোগ করতে আসি নি, কর্তব্য শেষ করতে এসেছি। চল, আগে তোমাদের সমস্যা দেখে আসি।

আর তর্ক করতে সাহস পেলেন না মিঃ বিগো। মিঃ বিগো ছেলে এবং তাঁর শিক্ষককে নিয়ে মদের ফ্যাক্টরীর দিকে পা বাড়ালেন।

ফ্যাক্টরীর ভেতরের দৃশ্য দেখে লুই পাস্তুরের মনে দুঃখের স্রোত বয়ে গেল। হাজার হাজার ড্রাম পড়ে রয়েছে ফ্যাক্টরীর মধ্যে। সবগুলি ড্রামের মদ পচে গেছে। মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। এত কষ্ট করে সব তৈরি হয়েছে, সবই বৃথা হয়ে গেছে।

দুটো পচা ড্রাম আমার বাড়ি পাঠিয়ে দাও। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পাস্তুর বললেন। এ যেন সে পাস্তুর নয়। এ কণ্ঠস্বর যেন সম্পূর্ণ এক অচেনা পাস্তুরের।

লুই পাস্তুর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে এলেন। মিঃ বিগো ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা অভদ্র লোক ত! যাবার সময় একটি কথাও বললেন না।

ছেলে সশ্রদ্ধ চিত্তে জবাব দিল—বাবা, উনি ধ্যাননিমগ্ন হয়ে গেছেন। আর কারুর কথা শুনতে পাবেন না। কারুর উপস্থিতিও বুঝতে পারবেন না।

একমাস ধরে দিররাত সাধনা করে চললেন অধ্যাপক লুই পাস্তুর। কোথা দিয়ে রাত কেটে যায় ভ্রূক্ষেপ নেই, কখন সূর্য ওঠে—তারও হুঁস নেই। পাস্তুরের ল্যাবোরেটরীতে এখন খালি নানা রকমের মদ, দুধ সাজানো রয়েছে। কোনটা পচে গেছে, কোনটা ভাল আছে।

একদিন—দুদিন—তিনদিন—

পরপর তিনদিন একই পরীক্ষা করে দেখলেন ফলাফল নিখুঁত। একমাস পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে লুই পাস্তুর ঘোষণা করলেন—পেয়েছি। সমস্যার সমাধান পেয়েছি।

তিনি বিজ্ঞানীদের সভা ডাকলেন। সভায় ঘোষণা করলেন, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন্ নয়। মদের পিপেগুলো খোলা অবস্থায় পড়ে থাকার জন্যে, মদের মধ্যে একরকমের জীবাণু জন্মায়। সেই জীবাণুর প্রতিক্রিয়ায় মদে পচন ধরে, দুধেও ওই একই কারণে পচন ধরে।

বিরোধীপক্ষের বিজ্ঞানীরা তর্কযুদ্ধে বললেন—প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করব না এই যুক্তি।

—বেশ। প্রমাণ দিচ্ছি—

পাস্তুর একটি বোতল তুলে নিয়ে বললেন—এই বোতলের মধ্যে মদ আছে। আমি মদের বোতল গরম করছি। আপনারা সবাই জানেন গরম করলে জীবাণু বাঁচতে পারে না। আমি পরীক্ষায় দেখেছি ৫৫° সেন্টিগ্রেডে কোন খাদ্য গরম করলে সেই খাদ্যের প্রকৃতি বদলে যায় না, অথচ জীবাণুগুলোও বাঁচতে পারে না, তাই ৫৫° সেন্টিগ্রেডে গরম করেই ছিপি এঁটে দিলাম।

এবার বোতলঠি রেখে দিলে, যতদিন না ছিপি খুলবেন, ততদিন কোন পচন ধরবে না।

—আমরা এসব বিশ্বাস করি না। জীবাণু এল কোত্থেকে? বিরোধীপক্ষের দলপতি প্রশ্ন করলেন।

পাস্তুর ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন—কোটি কোটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু সবসময়ে আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব জীবাণু খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। বোতলের ছিপি যদি আলগা থাকে অথবা বোতলের খালি জায়গায় এইসব জীবাণু বেঁচে থাকে। জীবাণুগুলিকে যদি না মারা হয়, তাহলে তারা মদের মধ্যে গ্যাঁজলা কাটতে শুরু করে, ফলে মদে পচন ধরে। আমার আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে বোতলের মধ্যে কোন জীবাণু বেঁচে থাকবে না, ফলে পচনের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

পাস্তুরের বিপক্ষে আর কোন প্রশ্ন উঠল না। বিরোধীপক্ষ সশ্রদ্ধ চিত্তে পাস্তুরের পদ্ধতি মেনে নিলেন। পাস্তুরের আবিষ্কৃত পদ্ধতির নামকরণ হল পাস্তুরাইজেশন্। শুধু ফরাসীর নয়, সারা পৃথিবীর সুরাশিল্প পাস্তুরাইজেশনের কল্যাণে রক্ষা পেল।

আবার আহ্বান। এবার ছাত্র নয়, শিক্ষক। লুই পাস্তুরের প্রবীণ শিক্ষক রসায়নবিদ জীন্-ব্যাপ্টিস্ট্ আন্দ্রেঁ ডুমা দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে সবিনয়ে লিখলেন—কল্যাণীয় পাস্তুর, তোমার তীক্ষ্ণ মেধা নিশ্চয়ই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আমি তোমার শিক্ষক। গুরু। তোমার চেয়ে বয়সে প্রবীণ, কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করতে অপারগ। তুমি জান দক্ষিণ ফ্রান্সের রেশম শিল্প আজ বিপন্ন এবং মৃতপ্রায়। কি এক অজানা রোগে গুটিপোকাগুলি শুকিয়ে মারা যাচ্ছে। এখানকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন সমস্যার সমাধান করবার জন্য। কিন্তু আমি হেরে গিয়েছি। আমি এই অজানা রোগের হদিশ করতে পারি নি। তুমি এসে আমাকে এই অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবে এই প্রত্যাশাতেই চিঠি লিখছি।

লুই পাস্তুর অনেকক্ষণ ধরে চিঠি পড়ে চিন্তা করলেন, তারপর প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে ছোট্ট চিঠি লিখলেন।

মান্যবরেষু অধ্যাপক ডুমা,

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পড়লাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রেশন শিল্পজাত সমস্যা আমার গবেষণার আওতায় পড়ে না, তাই এ ধরনের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে আমি অসমর্থ।

আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রণাম নেবেন। ইতি প্রণতঃ ছাত্র লুই পাস্তুর।

চিঠির জবাব অতি শীঘ্র ফিরে এল। কাতর আহ্বান। অধ্যাপককে, শিক্ষককে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করলেন প্রফেসর ডুমা।

কোমল মন পাস্তুরের। ছাত্রের দুঃখে যেমন মন নরম হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি শিক্ষকের দুঃখে মন দ্রবীভূত হয়ে গেল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে লুই পাস্তুর তাঁর অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু মাইক্রোস্কোপটিকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে পাড়ি দিলেন।

তিনবছর অক্লান্ত সাধনা আর গবেষণা করে ১৮৬৮ সালে লুই পাস্তুর আবিষ্কার করলেন গুটিপোকার গায়ে দু রকমের জীবাণু বাসা বাঁধছে। এই জীবাণুগুলোর জন্যেই গুটিপোকাগুলো মরে শুকিয়ে যাচ্ছে, ফলে রেশম সুতো আর তৈরি হচ্ছে না।

পাস্তুর জীবাণুগুলোকে মারার পদ্ধতি আবিষ্কার করে বললেন—এই জীবাণুগুলোকে মারতে পারলেই রেশমশিল্পে আর সমস্যা থাকবে না। এই ধরনের রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। রোগগ্রস্ত গুটিপোকাগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে, নইলে ছোঁয়া লেগে সব গুটিপোকা মরে যাবে।

পাস্তুরের পদ্ধতিতে রেশমশিল্পের সমস্যার সমাধান হল। শিক্ষককে অসম্মানের হাত থেকে পাস্তুর বাঁচালেন।

এবার পাস্তুর গবেষণা শুরু করলেন নিজের মনের তাগিদে। তিনি মুরগীর কলেরা এবং অ্যানথ্রাক্স রোগের প্রতিকারের কথা ভাবতে লাগলেন। অনেকদিন গবেষণার পর, তিনি একদিন চিকেন-স্যুপের মধ্যে পুরনো কলেরার জীবাণু ছেড়ে দিয়ে, সেই স্যুপ কয়েকটা মুরগীকে ইনজেকশন দিলেন। মুরগীগুলো কয়েকদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে আবার সুস্থ গেল। তখন তাদের গায়ে জোরালো কলেরার জীবাণু ইনজেকশন দিয়ে দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় একটা মুরগীরও কলেরা হল না। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন পুরনো জীবাণু শরীরে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলে শরীরের মধ্যে সেই রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মায়, ইংরেজীতে যাকে বলে ইমিউনাইজেশন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জলাতঙ্ক রোগেয় জীবাণু অ্যানথ াক্স্ নিয়ে গবেষণা করে সার্থক হন, যে কথা আগেই বলেছি।

এই মৃত্যুঞ্জয় ক্ষণজন্মা প্রতিভা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অমর প্রতিভার সাক্ষী হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট্।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ চার

১৬ই অক্টোবর, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বোস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে জনসাধারণ দাঁড়িয়ে আছে অবাক্ বিস্ময়ে। সকলে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন, ডাক্তার জন্‌স্ কলিন্‌স্ ওয়ারেন অপারেশন করবেন এবং ডাক্তার উইলিয়ম্ টি. জি. মরটন্ অপারেশনের সময় আশ্চর্যরকমের একটি ওষুধ শোঁকাবেন রোগীকে যার ফলে রোগী অপারেশনের যন্ত্রণা একদম বুঝতে পারবেন না।

বোস্টন শহরের জেনারেল হাসপাতালের সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারের টেবলে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল। রোগীর কাঁধের ওপর বিরাট একটা টিউমার। সিনিয়র সার্জন ডাক্তার ওয়ারেন প্রস্তুত হয়ে আছেন। ডাক্তার মর্টন এলেই অপারেশন শুরু করা হবে। চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণ। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন মেডিকেল স্টুডেন্টস্, পরের সারিতে নার্স, তার পরের সারিতে সাধারণ মানুষ। সকলের মুখেই উত্তেজনা। এত দিন ধরে মানুষ অপারেশনের নাম শুনলেই ভয়ে আঁতকে উঠত। সবাই চেপে ধরত রোগীকে। সজ্ঞানে সার্জন অপারেশন করে দিতেন। যন্ত্রণায় চিৎকার করত রোগীরা। অনেক সময়ে যন্ত্রণা এত বেশী হত যে, রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটত। ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন, তিনি ইথার নামক একটি ওষুধের ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন। কিছুক্ষণ ইথার শুঁকলে রোগী বেহুঁশ হয়ে পড়ে, এবং যন্ত্রণার বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। এই সময়ে অপারেশন করলে, রোগীর কোন কষ্টই হবে না। ইথার শোঁকানো বন্ধ করলেই আবার রোগীর জ্ঞান ফিরে আসবে। যতক্ষণ রোগী অজ্ঞান থাকবে, ততক্ষণ সার্জন তাঁর ইচ্ছামত অপারেশন করতে পারবেন।

ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন থিয়েটারে পায়চারি করছেন অস্থির-ভাবে। মর্টনের দেখাই নেই। মর্টন যে সময় দিয়েছিলেন, তা পেরিয়ে গেছে। ওয়ারেন ঘড়ির দিকে তাকালেন। পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। বিরক্তির স্বরে তিনি বললেন—মর্টন আর আসবে না। তার বিখ্যাত ওষুধ নিয়ে, সে বোধহয় অন্য কোন অপারেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ওয়ারেন পুরনো পদ্ধতিতে অপারেশন করবার জন্য তৈরী হলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য দরজা দিয়ে ডাক্তার মর্টন ঘরে ঢুকলেন।

ডাক্তার ওয়ারেন একটু রাগের ঝাঁঝে বললেন—আর কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ?

—খুব জোর দু তিন মিনিট। মর্টন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন।

ডাক্তার মর্টন নিজের বাক্স খুলে ইথারের বোতল বার করলেন, সঙ্গে একটা মুখোস। মুখোসটি রোগীর মুখে পরিয়ে দিয়ে ডাক্তার মর্টন সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা কেউ ধূমপান করবেন না। এই ওষুধে বিন্দুমাত্র আগুনের ফুলকি পড়লে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

সকলে নিস্তব্ধ। আশ্চর্য ওষুধের ক্রিয়া দেখবার জন্য সকলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তার মর্টন মুখোসের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ইথার ঢালতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন—আপনার রোগী তৈরি। ইচ্ছে করলে ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন করতে পারেন।

ডাক্তার ওয়ারেন অপারেশন শুরু করলেন।

আশ্চর্য !

রোগী যন্ত্রণায় একটুও ছটফট করছে না। স্থির হয়ে শুয়ে আছে। ডাক্তার ওয়ারেন ধীরে ধীরে পুরো টিউমারটি নিখুঁত ভাবে অপারেশন করে দিলেন। অপারেশন শেষ হবার পর ডাক্তার মর্টন রোগীর মুখ থেকে মুখোস খুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোগীর জ্ঞান ফিরে এল। একজন মেডিকেল ছাত্র রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রোগী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—অপারেশন হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। আপনি বুঝতে পারেন নি ?

—না তো !

রোগী নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখলেন, অতবড় টিউমার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নার্স ট্রের ওপরে অপারেশন করা টিউমার এনে রোগীকে দেখিয়ে বললেন—এই দেখুন আপনার টিউমার।

—আশ্চর্য! আমি একটুও বুঝতে পারিনি।

১৬ই অক্টোবর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। সেই দিনটিকে 'ইথার ডে' হিসেবে চিহ্নিত করা হল। চারিদিকে ইথার দিয়ে অপারেশন করার চলন শুরু হয়ে গেল। সবাই ইথার দিয়ে অপারেশন দেখার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠল। চিকিৎসকরা তখন ঠিক করলেন ইথার দিয়ে অপারেশন দেখতে হলে মোটা 'ফি' দিতে হবে। অনেক টাকা দিয়ে লোকে ইথার-অপারেশন দেখা শুরু করলেন।

ডাক্তার মর্টন ঘোষণা করলেন তিনি ইথারের ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন, অতএব তাঁকে পুরস্কৃত করা হোক। কিন্তু দু'জন চিকিৎসক প্রতিবাদ জানালেন। প্রথম জন মর্টনের মাস্টারমশায় ডাক্তার চার্লস থমাস জ্যাকসন, দ্বিতীয়জন মর্টনের বন্ধু হোরেস ওয়েল্স্।

জ্যাকসন্ বললেন ইথারের ব্যবহার আমি আগে থেকেই জানতাম। মর্টন এবং তার সহপাঠীরা যখন আমার ল্যাবোরেটরীতে কাজ করত, তখন ইথার শুঁকে খেলা করত। আমি লক্ষ্য করে দেখতাম, যে সব ছেলেরা ইথার শুঁকে নেশা করত, তাদের সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ হত। এই থেকে আমার ধারণা হয়েছিল, ইথার বাজারে বিক্রির জন্য 'লেথিডন' নাম দিয়ে বার করেছিলাম।

হোরেস ওয়েল্স্ দাবি করলেন তিনি মর্টনের আগেই নাইট্রাস অক্সাইড্ দিয়ে অজ্ঞান করার প্রচলন শুরু করেছিলেন। অতএব রোগীকে অজ্ঞান করার কৃতিত্ব তাঁরও।

আমেরিকান কংগ্রেস ডাক্তার মর্টনের দরখাস্ত পেয়ে কি করবেন ভেবে পেলেন না। তাঁরা প্রায় সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন মর্টনকে এক লক্ষ পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন, কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদপত্রে থতমত খেয়ে গেলেন। কয়েক বছর ধরে সিনেটে এই ব্যাপার নিয়ে

তর্কবিতর্ক চলল। ডাক্তার মর্টনের তরফে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী সিনেটর ছিলেন। তাঁরা ক্রমাগত দাবি জানাতে লাগলেন, মর্টনকে পুরস্কার দেবার জন্যে। একদিন যখন এই ব্যাপার নিয়ে সিনেটে তর্ক হচ্ছিল, তখন একজন সিনেটর দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন—ডাক্তার মর্টন কখনই পুরস্কার পেতে পারেন না।

—কেন? তিনিই তো প্রকাশ্যভাবে ইথারের ব্যবহার করেছেন।

—না। ডাক্তার মর্টন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথারের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে এই ঐতিহাসিক ঘটনার চার বছর আগে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইথারের ব্যবহার প্রথম শুরু হয়।

—প্রমাণ দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। এই দেখুন—জর্জিয়া হাসপাতালে ডাক্তার ক্রফোর্ড ডব্লু লঙ্ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স্ ভেনেবল্ নামের এক রোগীকে ইথার দিয়ে অপারেশন করেছেন।

—এ ঘটনা যে সত্য তার প্রমাণ কি?

—এই দেখুন জেম্‌স্ ভেনেবল্-এর এফিডেবিট্। তিনি কোর্টে বিচারকের সামনে শপথ নিয়ে সমস্ত কথা স্বীকার করেছেন। এ ধরনের শপথ বাক্য কোন দিন মিথ্যে হয় না।

এফিডেবিটের কাগজ সমস্ত সিনেটর পড়তে লাগলেন। জেম্‌স্ ভেনেবল্ নিজে ঘোষণা করেছেন, ডাক্তার লঙ্ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমার পিঠের দুটো টিউমার ইথার শুঁকিয়ে অপারেশন করেন। ইথার শোঁকার জন্য আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিনি। আমি তখন অ্যাকাডেমিতে পড়তাম। ডাক্তার লঙ্ আমাকে বার বার অপারেশন করতে বলেন, কিন্তু যন্ত্রণার ভয়ে আমি অপারেশন করতে রাজী হইনি। ডাক্তার লঙ্এর বার বার অনুরোধে আমি আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম। একদিন বিকেলবেলায় স্কুল ছুটি হয়ে যাবার পর আমার অপারেশন শুরু করা হল। বেশ মনে আছে দিনটি ছিল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে।

আমি ইথার শুঁকতে আরম্ভ করলাম। তখনও অপারেশন শুরু হয়নি। কখন আমার অপারেশন আরম্ভ হয়েছিল, আমি জানি না। জ্ঞান হতে দেখি আমার অপারেশন শেষ হয়ে গেছে। টিউমার দুটি বাদ হয়ে গেছে এবং অপারেশনের ব্যথা যন্ত্রণা বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারিনি।

আমেরিকান কংগ্রেসের অধিবেশনে এই এফিডেবিট্ পাঠ করার পর সমস্ত সদস্য আর তর্ক করতে সাহস করলেন না, এবং নির্বাক্ হয়ে গেলেন। ডাক্তার মর্টনকে কোন আর্থিক পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হল না। আমেরিকা ইউনিভারসিটি থেকে তাঁকে শুধু অনরারি ডিগ্রী দেওয়া হল এবং ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ্ সায়ান্স থেকে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হল। ডাক্তার মর্টন-এর মন একেবারে ভেঙে গেল এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করলেন।

ভেনেবল্এর এফিডেবিটের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে, কারণ ভেনেবল্এর এফিডেবিট ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে মোটেই পেশ করা হয়নি। এই এফিডেবিট প্রকাশ করা হয়েছিল ডাক্তার মর্টন-এর প্রকাশ্য ঘোষণার তিনবছর পরে।

মর্টন বা আমেরিকার ইথার ব্যবহারের পরই পৃথিবীতে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রচলন হয়নি। মর্টনএর কৃতিত্বের কথা বৃটিশ সার্জনদের কানে আসে। বৃটিশ সার্জনদের অন্যতম ডাক্তার জেম্স্ ওয়াই সিম্পসন, গ্লাসগো ইউনিভারসিটির প্রসূতিবিদ্যার প্রফেসর অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে প্রসবের প্রচলন শুরু করলেন।

ডাক্তার সিম্পসন্ ইথারের বদলে ক্লোরোফর্মএর ব্যবহার শুরু করেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর ঘোষণা করলেন, ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে সুন্দরভাবে, নির্বিঘ্নে প্রসব করানো যায়। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কার করেন ফরাসী কেমিস্ট জীন্ ব্যাপ্টিস্ট আদ্রে ডুমা।

ডাক্তার সিম্পসনকে ধর্মযাজকরা তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন।

তাঁরা সিম্পসনের পদ্ধতিকে পাপপূর্ণ বলে ঘোষণা করলেন। তাঁরা বললেন বাইবেলে বর্ণিত আছে ঈশ্বর নারীকে বলেছিলেন, সন্তান জন্মের সময় তোমাদের ব্যথা হবে। সেই ব্যথা অনুভব করার পর জীবনের পাপ লাঘব হবে।

ধর্মযাজকরা বাইবেলের উক্তি ঘোষণা করে বললেন কেউ যেন সিম্পসনের পদ্ধতিতে প্রসব না করায়। দেশসুদ্ধ সকলে ডাক্তার সিম্পসনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগলেন এবং কেউ প্রসবের সময় যেন ক্লোরোফর্ম ব্যবহার না করেন। ডাক্তার সিম্পসন্ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে এই সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের খণ্ডন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শুনল না। সিম্পসন্‌কে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে প্রসব করানো সকলে মিলে বন্ধ করে দিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুইন ভিক্টোরিয়ার সপ্তম সন্তান কুমার লিওপোল্ড জন্মগ্রহণ করেন। লিওপোল্ড জন্মানোর সময় রানী ভিক্টোরিয়ার অসম্ভব রকমের প্রসবব্যথা হয়। তিনি প্রসবব্যথায় পাগল হয়ে যাবার মত হলেন। অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় না পেয়ে, তিনি সকাতরে চিকিৎসককে বললেন—আমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে দিন।

কুইন ভিক্টোরিয়াকে ক্লোরোফর্ম শুঁকিয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হল এবং নির্বিঘ্নে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। যেদিন ভিক্টোরিয়াকে বেহুঁশ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করানো হল, সেদিন থেকে সমস্ত ধর্মযাজক একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। দেশের জনসাধারণও আর কোন সমালোচনা করতে সাহস করলেন না। সেদিন থেকে সারা পৃথিবীতে অ্যানেস্থেসিয়ার প্রচলন হল।

অ্যানেস্থেসিয়া আবিষ্কৃত হবার পর চিকিৎসাশাস্ত্রে সার্জারির কত উন্নতিসাধন ঘটেছে। যে সব অপারেশনের কথা আগে কল্পনাও করা যেত না, অ্যানেস্থেসিয়া আবিষ্কৃত হবার পর সেই সব অপারেশন নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এখন এক একটি অপারেশন

সাত আট ঘণ্টা ধরে করা হয়, তা শুধু সম্ভব হয়েছে অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য, অথচ সাধারণ মানুষ অ্যানেস্থেটিস্টএর নাম পর্যন্ত জানতে পারেন না ; খ্যাতি হয় শুধু সার্জনের। একটি রোগীর সফল অপারেশনের জন্য সার্জনের যতখানি কৃতিত্ব, ঠিক ততখানি কৃতিত্ব যিনি অপারেশনের সময় রোগীকে জ্ঞানহীন করে রাখেন।

আবিষ্কারের কাহিনী ॥ পাঁচ



ব্যাটিস্টা গ্রাসী এবং রবার্ট কক্ যখন ইটালীর মাঠে মাঠে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ভারতবর্ষে আর একজন লোক ম্যালেরিয়ার কারণ সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলেন।

তাঁর নাম রোনাল্ড রস্।

রোনাল্ড রস্ (Ronald Ross)-এর জন্মভূমি ভারতবর্ষে, হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়া শহরে। রোনাল্ডের বাবা একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং সীমান্তবর্তী দেশের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতেন, কিন্তু রোনাল্ড সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছেলে ছিল। তার গান শিখতে খুব ভাল লাগত। নিজে গান লিখতো আর নিজের মনে তাতে সুর দিত। বাবা দেখলেন ছেলে ভারতে থাকলে একেবারে বিগড়ে যাবে, তাই ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ। পাস্তুরের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে।

অনেক ছাত্রই সাধারণতঃ ডাক্তারি পড়ার জন্য উৎসুক। রোনাল্ডও ডাক্তারি পড়তে ঢুকলো। কিন্তু ডাক্তারিতে একটুও মন ছিল না। সে পাস করল বটে, কিন্তু প্রেসক্রিপশন লিখতোই না। তার বদলে সে শুরু করল উপন্যাস লিখতে। তার ধারণা ছিল, সে যা উপন্যাস লিখছে, প্রকাশকরা শুনলে চমকে উঠবে। দেশের চারদিকে হইহই পড়ে যাবে!

কিন্তু হায়! রস্ পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরল, কিন্তু কেউই পাত্তা দিল না। কেউ হয়ত দয়াপরবশ হয়ে পাণ্ডুলিপি শুনতো, কিন্তু চমকে ওঠা দূরে থাকুক, উপন্যাস প্রকাশ করার ধারে কাছে যেত না। রোনাল্ড তখন নিজের পয়সায় উপন্যাসগুলো ছেপে ফেললো, ভাবলো এবার দেশবাসী অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, এই নতুন ঔপন্যাসিক কে?

চারদিকে তার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় কী? কেউ রোনাল্ডের ছাপানো বই উলটেও দেখলো না। একখানা বইও বিক্রি হল না।

এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে রোনাল্ডের বাবা কঠোর ভাবে চিঠি দিলেন,—বাঁদরামি করার জন্য টাকা পাঠাই না। তোমাকে আর টাকা পাঠাবো না। তুমি নিজে রোজগারের বন্দোবস্ত কর।

রোনাল্ড নিরুপায় হয়ে এক জাহাজের ডাক্তার হলেন। জাহাজটি লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাতায়াত করতো। এইজাহাজে বসে বসে কবিতা লিখতেন তিনি। জীবনের ব্যর্থতার কথা লিখতেন, মানুষের যন্ত্রণার কথা লিখতেন। যাত্রীদের হাসিকান্না নিয়ে রচনা করতেন নতুন নতুন কবিতা।

এমন সময় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। ভারতবর্ষে ডাক্তার হয়ে ফিরে এলেন তিনি। ভারতে আসাতে তিনি খুব খুশীই হলেন। অতি অল্প সময়ের জন্যে তাঁকে রোগী দেখতে হত, বাকী সময়টা কবিতা লিখে কাটিয়ে দিতেন।

বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে রস্ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন, আর ফিরে গিয়েই নতুন ভাগ্যের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে মিস রোসা ব্লক্সাম্ (Miss Rosa Bloxam)-এর বিবাহ হল, তারপর তিনি স্ত্রীসহ ভারতে ফিরলেন। ফেরার সময় জাহাজের বিষয় নিয়ে লিখলেন 'চাইল্ড অফ ওসান' (Child of Ocean) উপন্যাস। সেই বোধহয় তাঁর শেষ উপন্যাস। সাহিত্যিক রোনাল্ড রস্ বৈজ্ঞানিক হয়ে গেলেন কোন এক জাদুমন্ত্রে। রস্এর মাথায় ঢুকলো—কেন এত নেটিভ হিন্দু ম্যালেরিয়ায় মারা যায়? ম্যালেরিয়া কেন হয়? যে লোক কিছুদিন পূর্বেও কালি-কলম নিয়ে মত্ত ছিলেন উপন্যাস কবিতা রচনা করার জন্যে, তিনিই এখন মাইক্রোস্কোপের তলায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্বেষণে তন্ময়।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু—? হ্যাঁ—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনার চিকিৎসক ল্যাভেরান বলেছেন ম্যালেরিয়ার স্বতন্ত্র জীবাণু আছে। সেই জীবাণু রক্তের ভিতর প্রবেশ করলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে।

আরম্ভ হল গবেষণা। দিনের পর দিন রোনাল্ড রোগীদের আঙুলে ফুটিয়ে রক্ত বের করে নেন। তারপর সেই রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পান না। কোথায় ল্যাভেরানের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার জীবাণু? যত সব বাজে!

এদিকে হয়েছে আর এক বিপদ। রোগীরা আঙুল ফুটো হবার ভয়ে আর হাসপাতালের দিকে পা বাড়ায় না। হাতে পায়ে ধরে, ভিক্ষে করে রোনাল্ড যে কয়জনের রক্ত পান, পরীক্ষা করে তাতে কিছুই দেখতে পান না। দিনের পর দিন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে রোনাল্ড হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন,—না, ল্যাভেরান নিশ্চয়ই ভুল দেখেছেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। ছত্রিশ বছর বয়স তখন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। জীবনে যা কিছু করতে গিয়েছেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন বার বার।

কিন্তু এই ব্যর্থ হয়ে লণ্ডনে আসার পেছনে বোধ হয় সৌভাগ্যের ইঙ্গিত ছিল। অলক্ষ্যে তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁকে নিয়ে গেলেন লণ্ডনের একটি বাড়িতে, যেখানে প্যাট্রিক ম্যানসন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। প্যাট্রিক ম্যানসন সাংহাইতে প্রাকটিস করতেন। তিনি সেখানে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন মশা চীনাদের শরীর থেকে জীবাণু চুষে চুষে খায়। তিনি আরও বলেছিলেন এই জীবাণুগুলো মশার পেটে জন্মায়। হারলি স্ট্রীটের বিখ্যাত ডাক্তাররা ম্যানসনের এই উদ্ভট উক্তিকে বিদ্রূপ করে বলতেন,—ম্যানসন হলেন চিকিৎসা জগতের জুলে ভার্নে (Jules Verne)।

জুলে ভার্নের কথা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। টোয়েন্টি থাউস্যাণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী, মিষ্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড, জার্নি টু দি সেন্টার অফ দি আর্থ, রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন্ এইটটি ডেজ্ প্রভৃতি অমর সাহিত্যের স্রষ্টিকর্তা। সাবমেরিন আবিষ্কারের পূর্বেই তিনি সাব-মেরিনের কথা লিখে গিয়েছিলেন। এরোপ্লেন আবিষ্কারের আগে তিনি বেলুনের কথা কল্পনা করে লিখে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁর লেখা পড়ে হাসতেন। বলতেন গাঁজাখুরি লেখার রাজা হলেন জুলে ভার্নে।

ম্যানসনের কথাকে কেউ বিশ্বাস করতেন না বলে সবাই তাঁকে জুলে ভার্নের সঙ্গে তুলনা করতেন।

অবিশ্বাস করেন নি একজন, তিনি রোনাল্ড রস্।

প্রত্যহ প্যাট্রিক ম্যানসনের বাড়িতে তিনি আসতেন, চুপচাপ বসে শুনতেন। ম্যানসন তাঁকে উপদেশ দিতেন,—রোনাল্ড, তুমি ভারতে ফিরে যাও। আমি বলছি তুমি ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করতে পারবে। তুমি ঠিক পথেই চলেছো। শুধু ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও, দেখবে একদিন তুমি সফল হবে। তুমি যেটুকু খুঁজে পাবে আমায় চিঠি লিখে জানিও। যদি কোন সমস্যায় পড়, তাও জানিও—আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করবো।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ স্ত্রী-পুত্র রেখে একা রোনাল্ড রস্ প্যাট্রিক ম্যানসনের আশীর্বাদ মাথায় করে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন।

ভারতবর্ষ তখন এক নতুন জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত। বাঙলা-দেশের যুবকের দল তখন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রে জাগ্রত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সে সময় এক কাণ্ড বাধলো। আর সেই গোলমাল থেকে সর্বভারতীয় বিপ্লব শুরু হল। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা দেশপ্রেমিক হয়ে উঠলেন, কারণ তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিকতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. পাস করার পরও তাঁকে কোন চাকরি দেওয়া হয় নি। অনেক গোলমালের পর অবশেষে তিনি চাকরি পেলেন, কিন্তু বিনা কারণে কয়েকদিনের মধ্যে আবার চাকরি চলে গেল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাকরি যাওয়ার ফলেই সুরেন্দ্রনাথ একজন সর্বভারতীয় নেতা হয়ে উঠলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম বোম্বাই শহরে এক জাতীয় অধিবেশন আহ্বান করেন। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নামে এক বাঙালী ব্যারিস্টার সেই সভার সভাপতি ছিলেন। সেই অধিবেশনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। তার পরের ইতিহাস জাতির সংগ্রামের ইতিহাস। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রাম কাহিনী।

এই রকম সময় রোনাল্ড রস্ ভারতবর্ষে পদার্পণ করলেন। তাঁকে অবিলম্বে সেকেন্দ্রাবাদের সৈন্য শিবিরে বহাল করা হল। সেখানে তিনি অল্প কয়েকদিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। কোন রোগী তাঁর কাছে যেতে চায় না। সবাই ভয় পায়। বলে, ওই পাগলা ডাক্তারের কাছে গেলেই, হাত ফুটিয়ে রক্ত নেয়। ওর কাছে কেউ যাবো না।

শিবিরের কর্নেল পর্যন্ত ভাবলেন রস্এর মাথা খারাপ হয়েছে এবং পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করে

বিরক্ত হয়ে রস্ ম্যানসনকে চিঠি লিখে জানালেন, রিসার্চ একটুও এগোচ্ছে না। কেউ রক্ত দিতে চায় না।

ম্যানসন উত্তর দিলেন, তুমি ভুল পথে যাচ্ছো। লোক না চিরে, মশা চিরে দেখো কোন কিছু পাও কিনা!

নতুন ভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন রস্। মশা ধরেন আর চিরে মাইক্রোস্কোপের নীচে রেখে পরীক্ষা করেন। কোন রোগী পেলে তার গায়ে মশা ছেড়ে দেন আর সেই মশা ধরে পরীক্ষা করেন। কিন্তু কিছু পান না। তাঁর অত্যাচারে রোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ভয়েতে কেউ তাঁর ধারে কাছে যায় না। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখে তাঁকে বাঙ্গালোরে বদলি করে দিলেন। সেখানে তখন ভীষণ কলেরা হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ রোনাল্ডের ওপর আদেশ দিলেন যেন কলেরা অতি অবশ্য বন্ধ হয়। কিন্তু কলেরা তিনি বন্ধ করতে পারলেন না। অগত্যা আবার তাঁকে সেকেন্দ্রাবাদে বদলি করা হল। রোনাল্ড প্রার্থনা করলেন যেখানে ম্যালেরিয়া বেশী এমন জায়গায় তাঁকে বদলি করলে খুব ভাল হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন। সাহেব ডাক্তাররা সহজে ম্যালেরিয়াদুষ্ট জায়গায় যেতে চাইতেন না, তাই সহজেই রোনাল্ডের আবেদন মঞ্জুর হল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে তাঁকে বদলি করা হল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের দক্ষিণে তখন প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালে মহানন্দে রোনাল্ড গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। রোনাল্ড দুজন সহকর্মী বহাল করলেন। একজনের নাম মহম্মদ বক্স। অন্যজন পারবুনা। এই দুজনে রাজ্যের মশা ধরে নিয়ে আসতো আর পরমানন্দে রস্ মশার দেহ চিরে যেতেন।

আর দিনের পর দিন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে চোখ রেখে চলত তাঁর অক্লান্ত সাধনা।

একদিন পেলেন। এতদিনের সাধনার পর হঠাৎ একদিন তাঁর সিদ্ধির পথ খুলে গেল। তিনি পরম আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলেন ধূসর

রঙের মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু রয়েছে।··কেটে চলেছেন। উন্মাদের মত একটার পর একটা মশা চিরে যাচ্ছেন আর জীবাণু দেখতে পাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক পশু-পাখির দেহের ভিতর জীবাণু প্রবেশ করানো যায় কিনা ?

আরম্ভ করলেন গবেষণা। পাখির শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পাখির দেহে ম্যালেরিয়া ফুটে উঠল। তারপর সেই ধূসর রঙের মশাদের পাখির গায়ে ছেড়ে দিলেন। দেখলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশার পেটের ভিতর চলে গেছে। মশা যখন পাখিকে কামড়াল তখন শুঁড় দিয়ে রক্ত টেনে নিয়েছিল। রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও সে শুষে নিয়েছে। সেই মশাগুলোকে কয়েকদিন খাঁচায় রেখে আবার ভাল পাখিদের গায়ে ছেড়ে দিলেন, দেখলেন ভাল পাখিদেরও ম্যালেরিয়া হয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন রোনাল্ড রস্। তাঁর আবিষ্কারের কথা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করলেন আর তাঁর গুরু প্যাট্রিক ম্যানসনকে লিখে জানালেন,—আমি ম্যালেরিয়ার সন্ধান পেয়েছি। ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাখির দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছি। আমার বিশ্বাস, এই ধূসর রঙের মশা দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

প্যাট্রিক ম্যানসন চিঠি পড়ে রস্‌কে উত্তর দিলেন,—প্রিয় রস্, তোমার সার্থকতার কথা পড়লাম। তুমি পাখির শরীরে ম্যালেরিয়া রোগ তৈরি করেছো শুনে সত্যই আমি আনন্দিত। কিন্তু তোমার রিসার্চের শেষ এখনো হয় নি। পাখির শরীরে যা সত্য, মানুষের শরীরেও যে তাই ঘটবে এ ধারণা তোমার কিসে হল ? যতক্ষণ তুমি প্রমাণ করতে না পারবে যে মানুষের শরীরেও ওই একই ভাবে রোগ সংক্রামিত হয়, ততক্ষণ তোমার রিসার্চ অসম্পূর্ণ। তুমি আরও রিসার্চ চালিয়ে যাও। আমার আশীর্বাদ রইল।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। ইটালীর গ্রামে গ্রামে রবার্ট কক্ ও জিওভানী ব্যাটিস্টা গ্রাসী (Giovanni Battista Grassi) নামে দুজন বৈজ্ঞানিক ম্যালেরিয়ার বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। দেখা যাক সম্মানের জয়মুকুট ইটালীর ভাগ্যে যায় না ইংলণ্ডের ভাগ্যে যায়!

রোনাল্ড রস্ যখন ভারতবর্ষের বুকে বসে আবিষ্কার করেছেন ধূসর রঙের মশার পেটে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করে, আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া রোগ হয়, তখন ইটালীতে দুজন মনীষী ম্যালেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। একজন স্বনামধন্য রবার্ট কক্ অন্যজন তরুণ বৈজ্ঞানিক ব্যাটিস্টা গ্রাসী।

গ্রাসী সজোরে মাথা নেড়ে রবার্টকে বললেন,—জানেন, আমি ইটালীর এমন জায়গা দেখেছি, যেখানে মশা ভরতি অথচ সেখানে ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু এমন একটি জায়গাও দেখিনি যেখানে ম্যালেরিয়া আছে অথচ মশা নেই।

—তা থেকে তোমার কী মনে হয়?—প্রবীণ বৈজ্ঞানিক থতমত খেয়ে নবীনকে প্রশ্ন করলেন।

—তা থেকে এই মনে হয় যে বিশেষ কোন শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করছে। আমার গবেষণা হবে কোন্ শ্রেণীর মশা এই জীবাণু বহন করছে তা আবিষ্কার করা।

কক্ গ্রাসীর কথা বিশ্বাস করলেন না। বার্ধক্যের জন্য তিনি ভালভাবে চিন্তা করতে পারতেন না। এলোমেলো যা-তা ভাবতেন।

ব্যাটিস্টা গ্রাসী ইটালীর প্রান্তরে প্রান্তরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি কেবল বলতেন,— ম্যালেরিয়া ইটালীর সর্বনাশ করে দিল। চাষীর দল এই রোগের মড়কে নিঃশেষ হয়ে গেল। যে করেই হোক এই রোগের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে।

ইটালীর কার্পাসিও উপত্যকায় রেললাইন পাতা আরম্ভ হয়েছিল তখন, কিন্তু রেল কোম্পানির কর্মচারীরা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উজাড় হয়ে যেতে লাগল। কেউ আর ভয়ে কাজ করতে চায় না। গ্রাসী এমনি একটা জায়গা খুঁজছিলেন নিজের গবেষণার জন্যে। তিনি ইটালীর সরকারকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অর্থ মঞ্জুর করলেন গ্রাসীর গবেষণার সুবিধের জন্যে।

গ্রাসী গবেষণা করতে করতে দেখলেন তিনি যা ভেবেছেন তাই ঠিক। বিশেষ একশ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। যেখানে সে মশা নেই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নেই। যেখানে সে মশার প্রাদুর্ভাব, সেখানেই ম্যালেরিয়ার মড়ক।

কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মশা জীবাণু বহন করে?

আবার গবেষণা। আবার অন্বেষণ। খুঁজতে খুঁজতে একরকম বিশেষ শ্রেণীর মশা খুঁজে পেলেন, যারা মানুষের দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করতে তারা বলল,—আমরা এই মশাদের জাঞ্জারোন (Zanzarone) বলি।

জাঞ্জারোন—জাঞ্জারোন···।

ব্যাটিস্টা গ্রাসীর মস্তিষ্কের ভিতর আগুন জ্বলতে লাগলো। তিনি স্পষ্ট দেখলেন রক্তপায়ী মশাদের লেজগুলো আকাশের দিকে তোলা, আর এগুলো স্ত্রী-মশক। বহুদিন আগে থেকেই বিশেষজ্ঞরা এই জাতের মশার নাম রেখেছেন অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার (Anopheles Claviger)।

অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজার। অ্যানোফিলিস ক্ল্যাভিজারের স্ত্রী-মশা ম্যালেরিয়া বহন করে বেড়ায়। সেই বাহক মশা যখন মানুষের রক্ত শোষণ করে, তখন দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয় ম্যালেরিয়ার জীবাণু। গ্রাসীর জীবনের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠল অ্যানোফিলিস মশা আর ম্যালেরিয়ার জীবাণু। যেখানেই অ্যানোফিলিস মশা দেখতে পান, পাকস্থলী চিরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পরীক্ষা করেন।

গ্রাসী রোমে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লিনসেই (Lincei) অ্যাকাডেমির সামনে তাঁর গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করলেন,—"অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে এবং মশার কামড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়।"

তারপর গ্রাসী রোমের হোলি স্পিরিট হাসপাতালের ডাক্তার ব্যাস্তিয়ানেলীর (Dr. Bastianelli) সঙ্গে দেখা করলেন। পাহাড়ের ওপর সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে এই হাসপাতাল। কোনদিন কোন লোক এখানে ম্যালেরিয়ায় ভোগে নি। গ্রাসী এখানেই নিজের গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন। সেই হাসপাতালের রোগী মিঃ শোলা এগিয়ে এলেন গবেষণার রোগী হিসেবে। তিনি বললেন,—আমার গায়ে যত ইচ্ছে মশা ছেড়ে দিন। আমার কিচ্ছু হবে না।

গ্রাসী, ব্যাস্তিয়ানেলী এবং গ্রাসীর অন্যতম সহকারী বিগনামী মিঃ শোলার গায়ে অ্যানোফিলিস মশা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর কিছুই হয় নি। ব্যাস্তিয়ানেলী একটু দমে গেলেন। রবার্ট কক্ ঘোষণা করলেন, গ্রাসীর আবিষ্কারে ভুল আছে। ম্যালেরিয়া মশা দ্বারা হয় না।

গ্রাসী দমলেন না। তিনি রোমের বাইরে চলে গেলেন, তারপর সেখান থেকে এক বাক্স অ্যানোফিলিস মশা ধরে নিয়ে এসে মিঃ শোলার গায়ে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন মিঃ শোলার কাঁপিয়ে জ্বর এলো।

গ্রাসী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মিঃ শোলার রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন, তাঁর রক্তের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বর্তমান।

গ্রাসীর সাধনা এতদিনে সার্থক হল।

হঠাৎ একদিন একটা মেডিকেল জার্নালের পাতা খুলে অবাক্ হয়ে গেলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ভারতবর্ষের কলকাতা শহরের প্রেসিডেন্সি

জেনারেল হাসপাতালে রোনাল্ড রস্ নামে এক ডাক্তার প্রমাণ করেছেন মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু জন্মায় আর সেই মশা পাখিকে কামড়ালে পাখির ম্যালেরিয়া হয়। ম্যালেরিয়া জীবাণু কেমন দেখতে তাও তিনি এঁকে দেখিয়েছেন। অবাক্ হয়ে গ্রাসী দেখলেন, তিনি যা আবিষ্কার করেছেন, অবিকল সেই জিনিসই রোনাল্ড রস্ আবিষ্কার করেছেন।

আবিষ্কারের তারিখটা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন ব্যাটিস্টা গ্রাসী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঠিক তাঁর আবিষ্কারের এক বছর আগে।

—কিন্তু আমি তো রস্এর নাম শুনিনি। আমি যা কিছু করেছি, নিজের মৌলিক গবেষণায় করেছি। অন্যকে তো অনুকরণ করিনি! অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড়িয়ে বললেন ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী। হতভাগ্য কেন বললাম তা একটু পরেই বুঝতে পারবে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রস্কে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট প্রিন্স অগাস্তি নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি লিখলেন,—ইসমেলিয়া শহরে এত বেশী ম্যালেরিয়ার উপদ্রব যে ক্যানালের কর্মীরা কাজ করতে পারছে না। যদি এই ভয়াবহ রোগ থেকে আমাদের না বাঁচান, তাহলে বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

চিঠি পেয়ে রোনাল্ড রস্ ইসমেলিয়া শহরে উপস্থিত হলেন। কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে দেখলেন শহরের এঁদো পচা নরদমায় কোটি কোটি শিশুকীট জন্মে রয়েছে। এগুলো থেকেই মশা উৎপন্ন হবে বুঝতে পারলেন তিনি। এগুলোকে মারতে পারলে মশার উপদ্রব কমে যাবে আর অধিবাসীরাও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পাবে। এখন, কী করে এই শিশুকীটগুলোকে মারা যায় তাই ভাবতে লাগলেন রস্। হঠাৎ একদিন মাথায় এলো অক্সিজেনের জন্যেই ওই কীটগুলো বেঁচে আছে। অক্সিজেন বন্ধ করে দিলে সব দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

অনেক ভেবে রস্ এক উপায় বের করলেন। নরদমায় টিন টিন তেল ঢালতে লাগলেন। তেলের একটা স্তর পড়ে গেল নরদমার ওপর। ফলে সব কীট তেলের তলায় পড়ে মরে গেল। ওদিকে জাদুর মত সমস্ত মশা শহর ছেড়ে পালাল। আর তার ফলে শহরও ম্যালেরিয়া মুক্ত হল।

রোনাল্ড রসের জয়জয়কার শুরু হয়ে গেল চারিদিকে। তিনি ইসমেলিয়া শহরকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করেছেন। ক্রমে সেই কথা ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছুল। দেখতে দেখতে বিশ্ববাসী জানতে পারল রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের কথা।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রোনাল্ড রসের কপালে আঁকা হল ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সম্মান সার উপাধি।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল কমিটি সার রোনাল্ড রস্‌কে নোবেল পুরস্কার দিলেন।

ইটালীর হতভাগ্য আবিষ্কারক ব্যাটিস্টা গ্রাসী হারিয়ে গেলেন বিস্মৃতির তলে। কেবল ইটালীর লোক ছাড়া অন্য দেশের লোকেরা ব্যাটিস্টা গ্রাসীর নাম ভাল করে শোনেও নি।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ ছয়

বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিসলির কাছে একটি উপহার এল আমেরিকা থেকে। জোসেফ প্রিসলির তখন দেশজোড়া

খ্যাতি। অল্প কয়েক বছর হল তিনি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। আমেরিকার বন্ধু তাঁকে উপহারের সঙ্গে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন।

বন্ধুবর প্রিস্‌লি,

তোমাকে একরকম গাছের রস পাঠালাম উপহার হিসেবে। আমেরিকার আদিবাসীরা এই রসকে বলে 'কচাও' (coutchue)। এই রসের কোন কাজ আছে কি না ঠিক জানি না, তবে শুনেছি মেক্সিকোর সম্রাট মণ্টেজুমা, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের রাজা হারনাডো কোর্টিস এবং তাঁর সৈন্যদলকে আপ্যায়ন করেছিলেন এক ধরনের খেলায়। এই গাছের রস শুকিয়ে তালের মত করে তাঁরা খেলেছিলেন।

তুমিও এখন খ্যাতিমান ব্যক্তি। তোমাকে উপহার দেবার মত কিছুই নেই, তাই এই সম্মানিত গাছের রসের তাল তোমাকে পাঠালাম। আশা করি তুমি এই তাল দিয়ে নতুন কিছু খেলা খেলতে পারবে। ইতি—

জোসেফ প্রিস্‌লি তালটি নিয়ে সত্যিই খেলা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পড়াশুনা করে, তাঁর মাথা টনটন করছে। বার বার একটা অঙ্ক পেনসিল দিয়ে করছেন আর মুছছেন। হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। পেনসিলের শিষের দাগ মোছার জন্য তিনি পাঁউরুটির গুঁড়ো ব্যবহার করতেন, কারণ আর কিছু তখনও ব্যবহারের জন্যে আবিষ্কৃত হয় নি।

অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। পাঁউরুটির গুঁড়ো দিয়ে ঘষে চলেছেন শিষের দাগ। খাতার বেশির ভাগটা কালো হয়ে গেছে ঘষার জন্য।

হঠাৎ বন্ধুর পাঠানো রসের জমানো তালটির দিকে নজর পড়ল জোসেফ প্রিস্‌লির। নিতান্ত খেলার ছলে তালটি নিয়ে খাতার ওপর

ঘষতে লাগলেন। জোসেফ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পেনসিলের দাগ সম্পূর্ণ উঠে গেল। সাদা ধবধবে খাতার পাতা। বিশ্বাসই করা যায় না, একটু আগেই এই পাতার উপর পেনসিলের দাগ কাটা ছিল।

আবার হিজিবিজি কাটলেন জোসেফ প্রিসলি। কচাও দিয়ে আবার ঘষলেন। সব ফরসা হয়ে গেল। পাঁউরুটির টুকরো দিয়ে যে দাগ তুলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী প্রিস্‌লি, বন্ধুর পাঠানো কচাও-এর আলতো ঘষাতে একদম মুছে গেল।

প্রিস্‌লি অবাক্। এত সহজে, এত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভাবতেও পারেন নি জোসেফ প্রিস্‌লি। কি নাম দেবেন কচাও তালের? কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর ঠিক করলেন কচাও দিয়ে যখন ঘষতে হবে (Rub) তখন এর নাম রবার দেওয়াই সমীচীন। জোসেফ প্রিস্‌লির আমেরিকাবাসী বন্ধুর পাঠানো উপহারের নাম হয়ে গেল রবার (Rubber)।

রবারের ব্যবহার শুরু হল উড্‌পেনসিলের শিষের দাগ তোলার জন্য। প্রিস্‌লির ঘোষণার পর থেকেই ইউরোপে কচাও রসের তাল রবার নামেই খ্যাতি লাভ করল এবং সকলেই পাঁউরুটির টুকরো ঘষে পেনসিলের দাগ তোলার বদলে রবার ঘষে দাগ তোলা আরম্ভ করলেন।

ইউরোপ এবং ইংলণ্ডের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি রবারের নানা ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা 'কচাও'কে আরও বড় রকমের সামাজিক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চার্লস্‌ গুডইয়ার এবং চার্লস্‌ ম্যাকিন্‌টশ্‌ রবার কিভাবে সুন্দর করে তৈরি করা যায়, তার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ম্যাকিনটশ্‌ দুপাশে কাপড় বিছিয়ে মাঝখানে রবার গলিয়ে লেপে দিলেন। ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে রবার কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে গেল। ম্যাকিনটশ্‌ জল ঢেলে দেখলেন জল ম্যাকিনটশের তৈরি

কাপড়ের ভেতর দিয়ে আসতে পারে না! ম্যাকিনটশ্ রবারের তৈরি কাপড় দিয়ে বর্ষাতি বানিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মহানন্দে হাঁটতে লাগলেন। জামাকাপড় ভেজার কোন চিহ্ন নেই।

খানিকটা পরে বৃষ্টি থেমে গেল, সূর্য উঠল। রোদের গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবার গলে যেতে সুরু করল এবং খানিকটা পরে দেখা গেল রবার একেবারে গলে জামা প্যান্টে লেপ্টে একসা হয়ে গেছে।

চার্লস্ গুডইয়ার চিন্তা করতে লাগলেন। রবার সম্বন্ধে জানতে হলে পড়াশুনা করতে হবে। কিছু না জেনে এ কাজে নামা ঠিক হবে না, অথচ চিন্তার জন্য নিরিবিলি সময় পাচ্ছেন না। তাঁর লোহালক্কড়ের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু এই গতানুগতিক ব্যবসায় তাঁর মন মোটেই বসে নি। তিনি নতুন কিছু করতে চান। সমাজকে নতুন কিছু দেবেন, অথচ তাঁর অর্থ হবে।

রবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বই গুড্ইয়ার সংগ্রহ করলেন।

রোজই পড়াশুনা করেন চার্লস্ গুড্ইয়ার। একদিন একটি গ্রন্থ খুলে তন্ময় হয়ে পড়লেন। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক জুয়ান ডি টরকুমাডা (Juan de torquemada) এক জায়গায় লিখেছেন মেক্সিকাম ইণ্ডিয়ানরা একরকম গাছের রস মিশিয়ে পোষাক ব্যবহার করেন। জুতো, জামাকাপড়, টুপিজাতীয় পোষাক গঁদের মত এই রস মিশিয়ে নেন। এই রস মিশিয়ে নিলে পোষাকের ভেতর দিয়ে জল ঢুকতে পারে না, কিন্তু রোদ আটকাতে পারে না, কারণ সূর্যের তাপ লাগলে এই রস গলে যায় এবং পোষাক নষ্ট হয়ে যায়।

গরমের হাত থেকে রবারকে ঠেকাতে পারলেই রবারের ব্যবহার আদৃত হবে। গুড্ইয়ার চিন্তা করতে সুরু করলেন, কিন্তু ব্যাঘাত পড়ল সদর দরজায় সজোরে কড়া নড়ে উঠতে। গুড্ইয়ার বই বন্ধ করে বাইরের দরজা খুললেন। দরজা খুলেই বিস্মিত। দরজার সামনে পুলিস অফিসার, তাঁর সঙ্গে অনেক পাওনাদার।

চার্লস ভুলেই গিয়েছিলেন হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ের কথা। দীর্ঘদিন

দোকানে না যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ে ভীষণ মন্দা পড়ে গিয়েছিল। বিক্রি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঋণের মাত্রা পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছিল। পাওনাদারেরা সম্মিলিতভাবে চার্লস গুড্ইয়ারের নামে কোর্টে কেস করে দিল।

পাওনাদারের টাকা না দিতে পারার জন্য চার্লস গুডইয়ারের জেল হয়ে গেল। আপীল না করে গুড্ইয়ার জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আশ্চর্য মনোবল ছিল চার্লস গুড্ইয়ারের। সামাজিক অসম্মান হওয়া সত্ত্বেও একটুও দমিত না হয়ে তিনি রবার সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন রবার পদার্থকে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত করা যায়, তাহলে পৃথিবীব্যাপী এর চাহিদা হবে আর অর্থাগমও হবে প্রচুর। যে রবার প্রিস্‌লি ম্যাকিনটশ ব্যবহার করেছিলেন তার অসুবিধে হচ্ছে গরমে গলে যায়, ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে ভেঙে যায়। সব ঋতুতেই রবারকে একইভাবে ঠিক রাখতে পারলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

গুড্ইয়ার জেলখানা থেকে বেরিয়ে রবারকে উন্নত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কচাও গাছের ছাল, রস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দিলেন। তাল তাল রবার নিয়ে আসেন আর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোন ফলই তিনি পেলেন না। এতদিনের কষ্ট, অসম্মান সবই এমন প্রকটভাবে চেপে ধরল যে গুড্ইয়ার অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পাড়ার লোকেরা তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। অনেকে বললেন—রিসার্চ না ছাই, আবার লোকের পয়সা মারার ফিকির। দোকানদার ধার দেওয়া বন্ধ করে দিল ; অভাবে, ক্ষিধের জ্বালায় পাগল হয়ে পড়বার মত অবস্থা হল চার্লস গুড্ইয়ারের।

একদিন গুডইয়ার এক রাসায়নিক পদার্থের দোকানে গিয়ে বললেন—আমায় একটু গন্ধক (Sulphur) দিতে পারেন ?

দোকানদার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—গন্ধক দিয়ে কি করবেন? পাঁউরুটি নিয়ে যান, পেটের জ্বালা কমবে তবু।

গুড্ইয়ার উত্তর দিলেন—গন্ধক খেয়েই জীবনধারণ করব, দরকার হলে আত্মহত্যা করব।

—না মশায়। আপনি মরবেন, মরুন, কিন্তু আপনার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী হতে পারব না। আপনি আসতে পারেন।

গুড্ইয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। মনের মধ্যে দৃঢ় চিন্তা। আত্মহত্যা তাঁকে করতেই হবে। ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে সমস্ত রকমের শাস্তিই দিয়েছেন। ব্যবসায়ে বিফল, ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে জেল পর্যন্ত খাটলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে অভাবের জ্বালায় এখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

অনেক ঘুরে ঘুরে গুড্ইয়ার একটি দোকান থেকে খানিকটা গন্ধক সংগ্রহ করলেন। গন্ধক মেশালে রবার খানিকটা পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু ভাল করে জমে না।

নিজের বাড়িতে এসে একটা ডেকচির মধ্যে খানিকটা গন্ধক ঢাললেন! ঘরের মধ্যে তাল তাল রবার জমানো। রবারের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া কেমন ভ্যাপসা হয়ে গেছে।

গুড্ইয়ার মরীয়া। এর আগেও অনেকবার গন্ধক মিশিয়েছেন রবারের সঙ্গে, কিন্তু কোন ভাল ফল পান নি। গুড্ইয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সঠিকভাবে পদার্থের বিষয় সম্পূর্ণ না জেনে ব্যবসায়ে নামবেন না। একবার তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, আর সে পথে যাবেন না। হয় কৃতকার্য হবেন, নইলে এ জীবন আর রাখবেন না।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দিনে গুডইয়ার সারাদিন চেষ্টা করেছেন কিভাবে রবারকে উন্নত করা যায়। নানারকম ভাগ করে গন্ধক মিশিয়েছেন রবারের সঙ্গে, সারাদিন চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ—ব্যর্থ হয়েছেন চার্লস গুড্ইয়ার। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন স্থির করে ফেলেছেন, এ জীবন আর তিনি রাখবেন না।

বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। সমাজের গ্লানি আর ধিক্কার বহন করে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

রবার আর গন্ধকের মিশ্রণ সামনের ডেকচিতে পড়ে আছে। এক দৃষ্টিতে ডেকচির দিকে তাকিয়ে আছেন গুড্ইয়ার। তাঁর চোখের কোণে জলের বিন্দু।

বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আত্মহত্যা করবেন গুড্ইয়ার। সমস্ত দিন পেটে একবিন্দু দানাপানি পড়ে নি। এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

রবার গন্ধক কি সরাসরি খাবেন? না—মানুষ হয়ে যখন জন্মেছেন, খাবার জিনিস কেন তিনি কাঁচা খাবেন? রান্না করে খাবেন। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে পারবেন, পৃথিবীতে শেষ খাওয়া পর্যন্ত তিনি রান্না করে খেয়েছেন।

একটা খালি ডেকচি উনুনের ওপর চড়িয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে শূন্য ডেকচিটা গরম হয়ে উঠল। এবার রান্নার জন্য কিছু দিতে হবে ডেকচির ওপরে, নইলে তেতে গরম হয়ে গলে যাবে ডেকচিটা।

কিছুটা রবার গন্ধক মেশানো মিকশ্চার ডেকচির ওপর ঢেলে দিলেন চার্লস গুড্ইয়ার।

আশ্চর্য!

গুড্ইয়ার বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখলেন গরম লেগেও রবার চটচটে হয়ে যায় নি। সুন্দর আছে। নরম নরম অথচ শক্ত। গলেও যাচ্ছে না, আবার শক্ত কাঠও হয়ে যাচ্ছে না।

গুড্ইয়ার নামিয়ে নিলেন ডেকচিটা। স্পঞ্জের মত নরম লাগছে গরম করা রবার মিশ্রণ।

ডেকচির মধ্যে জল ঢেলে দিলেন গুড্ইয়ার। ঠাণ্ডা করলেন। জলের মধ্যে হাত চুবিয়ে টিপে টিপে দেখলেন রবারের তালটা একই রকম আছে। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য কোন পার্থক্য ঘটে নি। ঠিক স্পঞ্জের মতই আছে।

আবার একটা ডেকচি চাপালেন উনুনের ওপর। একমুঠো রবার মিশ্রণ ছেড়ে দিলেন ডেকচিতে। আগের মতই এবারও রবার তৈরি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। গুডইয়ার আনন্দে আত্মহারা। রবার তৈরি করতে গেলে রবার গন্ধক মিশ্রণকে একটু গরম করে নিতে হবে।

তৈরি করা রবারগুলো উঠোনের মধ্যে ফেলে রাখলেন। সারারাত তুষারের ঠাণ্ডায় রবারগুলো পড়ে থাক। গরমে সুন্দর থাকে লক্ষ্য করেছেন গুডইয়ার। তুষারের ঠাণ্ডায় কেমন থাকে দেখতে হবে।

সকালবেলায় গুড্ইয়ার দেখলেন রবারের তালগুলি যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঠাণ্ডায় একটুও শক্ত হয় নি। স্পঞ্জের মতই নরম রয়ে গেছে। শক্তও হয়নি, বা ভঙ্গুর হয়নি। আগের রবারগুলো শক্ত হয়ে গেলেই একটু চাপ লাগলেই ভেঙে যেত।

গুড্ইয়ারের উৎসাহ নতুনভাবে দেখা দিল। তিনি আবার রিসার্চ সুরু করলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখলেন রবার-গন্ধক মিশ্রণের সঙ্গে চুন (Lime), ম্যাগ্নেসিয়া এবং শিসে (Lead) মেশালে রবার আরও উন্নত ধরনের হয়।

পাঁচ বছর ধরে নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করে দেখলেন গুড্ইয়ার। গরম না করলে কিছুতেই রবার তৈরি হতে পারে না, এ বিশ্বাস গুড্ইয়ারের দৃঢ়ভাবে হয়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন তাঁর পদ্ধতি পেটেন্ট করে ফেলা একান্তভাবে দরকার। পেটেন্ট করে নেওয়ার সুবিধে, প্রথম যিনি পেটেন্ট করবেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ওই পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে পারবেন না।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গুড্ইয়ার তাঁর পদ্ধতি পেটেন্ট করার জন্য দরখাস্ত করলেন। প্রথমে রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে নিতে হবে, তারপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে আগুনে গরম করতে হবে। কতটা গরম করতে হবে, সব তিনি নিখুঁতভাবে লিখে দিলেন দরখাস্ততে। আগুনে গরম করার পদ্ধতির নাম দিলেন 'ভালকানাইজেশন' (Vulcanization)। ভাল্কান্ (Vulcan) নামটি গুড্ইয়ারের

মাথায় এসেছিল তার কারণ ভাল্‌কান্‌ হচ্ছে রোমানদের আগুনের দেবতার নাম। ভগবানের নাম দিয়ে তিনি পেটেণ্টের দরখাস্ত করে দিলেন।

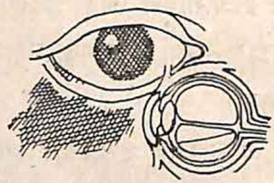
এমন সময় গুড্‌ইয়ার পেটেণ্ট পেলেন যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সুরু হয়েছে। ইউরোপের দিকে দিকে তখন শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। শিল্পের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে রবারের চাহিদাও বাড়তে লাগল।

শিল্পের সরঞ্জাম নিয়ে যাবার জন্যে নানারকম গাড়ির ব্যবস্থা তৈরি হল, কিন্তু মুশকিল হল চাকা নিয়ে। কারখানায় যেসব লোক যাতায়াত আরম্ভ করল, তারা একরকমের যানবাহন ব্যবহার করত, যার নাম 'বাইসাইকেল'। বাইসাইকেলের চাকা লোহা বা কাঠের তৈরি হওয়ার জন্য খুব ভারি হয়ে যেত আর চালাতেও কষ্ট হত।

গুড্‌ইয়ারের তৈরি রবার দিয়ে যদি চাকা বানানো যায়, তাহলে যানটি হালকাও হবে, যানের গতিও বাড়বে। গুড্‌ইয়ার তাঁর তৈরি রবার দিয়ে বাইসাইকেলের চাকা তৈরি করলেন, এবং দেখা গেল বাইসাইকেল অতি সহজে সুন্দর ও স্বচ্ছন্দগতিতে চলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, রবারের ব্যবহার সুরু হয়ে গেল। সভ্য সমাজে গুড্‌ইয়ারের তৈরি রবারের আদর বেড়ে গেল এবং চার্লস গুড্‌ইয়ার চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন ইতিহাসের পাতায়।

আবিষ্কারের কাহিনী ॥ সাত



ওডেসার চোখের হাসপাতাল। প্রফেসর ভি. পি. ভিলাটভ্ গভীরভাবে চিন্তা করছেন। একটি সুন্দর ছেলে ডাংগুলী খেলার সময় তার চোখে আঘাত পেয়েছিল। আঘাতটা লেগেছিল চোখের মণিতে। ঘা যখন শুকলো দেখা গেল চোখের মণি ঘষা কাচের মত অথবা পাথরের মত হয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে না, তাই চোখের ভেতরের অংশ পুরোপুরি ভাল থাকা সত্ত্বেও ছেলেটি অন্ধ হয়ে গেছে।

—কোন ওষুধ নেই ডাক্তারবাবু? যাতে আবার চোখের মণি স্বচ্ছ হয়ে যায়। ছেলেটির বাবা কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন।

—উঁহু। আমার অন্ততঃ জানা নেই। মাথা নেড়ে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

—তাহলে আমার ছেলে আর দৃষ্টি ফিরে পাবে না? ছেলেটির বাবার কণ্ঠস্বর কান্নার বেগে বন্ধ হয়ে এল।

—আজ তোমার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাও। আসছে সপ্তাহে এসো। এর মধ্যে ভেবে দেখি কী করতে পারি।

ছেলেটিকে নিয়ে তার পিতা চলে গেল।

ডাক্তার ফিলাটভ্ চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে ছেলেটির চোখ ভাল করা যায়। অনেক চিন্তা করে ঠিক করলেন যদি কোন লোকের ভাল চোখের মণি (cornea) পাওয়া যায়, তাহলে অস্বচ্ছ মণি কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায় স্বচ্ছ মণি লাগিয়ে দিলে যদি জুড়ে যায়, তাহলে আবার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে।

কিন্তু স্বচ্ছ ভাল মণি কোথায় পাওয়া যায় ?

ডাক্তার ফিলাটভ্ হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে রোগীদের বললেন—তোমরা একটি ছেলের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাকে সাহায্য করবে ?

—কি সাহায্য ? প্রায় একসঙ্গে সকলে জিজ্ঞাসা করল।

—তোমাদের মধ্যে কেউ একটা চোখের মণি আমাকে দান করবে ?

সকলেই নীরব। কে চোখ নষ্ট করবে ? চোখের মণি কেটে নিলে দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে এ সত্য সকলেরই জানা। সকলেই নীরব।

—তোমাদের দুটি চোখই আছে। ছেলেটির দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কেউ যদি একটা চোখ দান কর, অন্য চোখে দেখতে পাবে। ছেলেটির চোখ অপারেশন করে একটা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারি হয়ত। একটি বালকের জন্যে তোমরা কেউ একটা চোখ দান কর। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।

ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রত্যেক রোগীর বিছানার কাছে গিয়ে, বিনীতভাবে নিবেদন করতে লাগলেন। সমস্ত ওয়ার্ড নিস্তব্ধ। প্রত্যেক রোগী বাক্যহীন। হঠাৎ একটি অল্পবয়সী ছেলে বলে উঠল—আমার বন্ধুর জন্যে আমি একটা চোখ দান করব ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু পায়ে পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন যোশেফ। কাল তোমার বাবা মা এলে তাঁদের অনুমতি নিয়ে তোমার চোখ অপারেশন করব। আজ রাতে তুমি ঘুমোও।

যোশেফ পরম নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমলো কিন্তু ডাক্তার ফিলাটভের চোখে ঘুম নেই। যোশেফের মণি কেটে সেই মণি জোড়া দেবেন অন্ধ ছেলেটির চোখে। কিন্তু কী ভাবে করবেন ? চোখের মণিতে কোন রক্তশিরা নেই, সেলাই করার কোন জায়গা নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু অস্বচ্ছ মণিটা কেটে ফেলে দিয়ে সেই জায়গাতে স্বচ্ছ মণি বসিয়ে দিয়ে

ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সমস্ত রাত অস্থির পায়ে ছটফটিয়ে বেড়ালেন ডাক্তার ফিলাটভ্। পরদিন সকালে যোশেফের বাবা মা আসতে, তাঁদের সমস্ত কথা বলে যোশেফের মহান দানের প্রতিশ্রুতি শোনালেন।

যোশেফের বাবা মৃদু কণ্ঠে বললেন—বেশ, ডাক্তারবাবু আমার ছেলে যখন এত কথার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তখন তার অমর্যাদা করা অন্যায় হবে। .আপনি ওর চোখ নিন। আমার ছেলের একটি চোখ নিয়ে আর একটি ছেলে দৃষ্টি ফিরে পাক।

ডাক্তার ফিলাটভ্ সমস্ত আয়োজন করে ফেললেন। অন্ধ ছেলেটিকে একটি অপারেশন টেবলের ওপর শোয়ালেন, পাশের টেবলে শোয়ালেন যোশেফকে। ধীর অকম্পিত হাতে ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রথমে অন্ধ ছেলেটির মণি গোল করে কেটে অন্ধ ছেলের চোখের খাঁজে বসিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। যোশেফের চোখও ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

সাতদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুললেন ডাক্তার ফিলাটভ্। অন্ধ ছেলেটি আনন্দে লাফিয়ে উঠল—আমি দেখতে পাচ্ছি ডাক্তারবাবু। পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার ফিলাটভের আনন্দও আর ধরে না। তাঁর অপারেশন সার্থক হয়েছে। দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দান করতে পেরেছেন ডাক্তার ফিলাটভ্।

ডাক্তার ফিলাটভ্ ধীর পায়ে যোশেফের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার ব্যাণ্ডেজ খুলতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি জানেন ব্যাণ্ডেজ খোলার পর যোশেফ সে চোখে আর দেখতে পাবে না। সে বলবে—আমি এ চোখে দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তারবাবু—

নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ খুললেন ডাক্তার ফিলাটভ্। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর ডাক্তারবাবুকে আশ্চর্য করে দিয়ে যোশেফ জিজ্ঞাসা করল —যার জন্যে আমার চোখ নিয়েছেন, সে দেখতে পেয়েছে?

ফিলাটভের চোখে জল। অ্যাপ্রণের হাতায় চোখ মুছে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ যোশেফ, তোমার দান সার্থক হয়েছে।

১৯০৯ সালে ডাক্তার ফিলাটভ্ সর্বপ্রথম এই অপারেশন করলেন। প্রথম অপারেশনে সার্থক হবার পর ক্রমাগত তিনি এই অপারেশন করে চললেন, কিন্তু সমস্যা হল ভাল কর্ণিয়া যোগাড়ের। সকলেই তো আর যোশেফের মত মহৎ প্রাণের বালক নয়, যে এক কথায় চোখের ভাল মণি অন্য লোককে দান করে দেবে।

ডাক্তার ফিলাটভ্ মুশকিলে পড়লেন কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তিনি নতুন ভাবে গবেষণা শুরু করলেন। জীবনের মণি নেওয়ার বদলে মৃত রোগীর ভাল চোখের মণি কেটে নিয়ে বরফের ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে দিয়ে সেই মণি দিয়ে অপারেশনে কাজে লাগাতে লাগলেন। সকলে বলল মানুষ মরে যাবার পর তার শরীরের কোষে আর শক্তি থাকে না। সেই কোষ কখনও জীবিত মানুষের দেহে জোড়া লাগে ? ডাক্তার ফিলাটভের বিশ্বাস যে কোন প্রাণীর কোষ মৃত্যুর পরও সজীব থাকে, এবং সেই কোষ খুব ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে (২° থেকে ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) নষ্ট তো হয়েই না বরং কোষের মধ্যে সজীবতা আরও বাড়ে।

আশ্চর্য !

মৃত ব্যক্তির চোখের মণি রোগীর চোখে জোড়া লাগালে আরও ভালভাবে জোড়া লেগে যায়। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেপু দেখলেন সেলাই না করেও জোড়া লাগানো জায়গাটি এত সুন্দরভাবে জুড়ে গেছে যে স্বাভাবিক জায়গা থেকেও শক্ত হয়ে উঠেছে। একটি নয়, দুটি নয় অনেক মণি এমনিভাবেই সুন্দর জোড়া লেগেছে আর পরীক্ষার ফলাফল জীবিত মানুষের মণির চেয়েও অনেক ভাল। তাঁর দীর্ঘ পরীক্ষায় দেখলেন জীবিত মানুষের মণি নিয়ে অপারেশন করলে শতকরা চব্বিশ ভাগ ফল পাওয়া যায় অথচ মৃত ব্যক্তির

মণি নিয়ে অপারেশন করলে শতকরা চৌষট্টি ভাগ ফল পাওয়া যায়।

ডাক্তার ফিলাটভ্ আবার গবেষণা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন শুধু মণি নয়, শরীরের যে কোন অংশ মৃত্যুর পর শরীর থেকে কেটে নিয়ে হিমশীতল স্থানে রেখে দিলে, ত্বকের সজীবতা বাড়ে এবং সেই অতিসজীব ত্বক রোগীর রুগ্ন ত্বকের ওপর লাগিয়ে দিলে আপনা থেকেই সে অংশ জুড়ে যায়, ভাল হয়ে যায়।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ফিলাটভ্ পরীক্ষা করে চলেছেন। প্রত্যেকটি সংরক্ষিত ত্বকে এই অতিসজীবতা লক্ষ্য করলেন তিনি। তিনি বললেন মৃত্যুর পর কোষ কেটে নিয়ে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে রেখে দিলে সংরক্ষিত কোষগুলির মধ্যে কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়, যার জন্যে এই কোষগুলি ব্যবহার করলেই শরীরের ক্ষত কোষগুলি আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। তিনি এই পদার্থগুলির নাম দিলেন বায়োজেনিক স্টিমুলেটরস্।

১৯৪১ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। যুদ্ধের জন্য ডাক্তার ফিলাটভের পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। যাঁরা ফিলাটভের চিন্তাধারাকে অবিশ্বাস করছিলেন, তাঁরা বললেন—এ সব আজগুবি কথা। মৃত্যুর পর শরীরের কোন অংশই আর সজীব থাকে না।

—তাহলে আমি যে মণির জোড়া লাগিয়েছি সেগুলো কি মিথ্যে। ডাক্তার ফিলাটভ্ প্রতিবাদ করলেন।

—ওগুলো কাকতালীয়ভাবে জোড়া লেগেছে। মরা মানুষের মণি যেমন জোড়া লেগেছে, জীবিত মানুষের মণিও তেমনি জোড়া লেগেছে। সেইজন্যে এ থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

ডাক্তার ফিলাটভ্ বললেন—কিন্তু জীবিত মানুষের চোখের মণি দিয়ে যে অপারেশনগুলো করেছি, সেগুলো মোটেই ভাল হয়নি, তাছাড়া একশোটা অপারেশন করলে চব্বিশটা জোড়া লেগেছে, কিন্তু মৃত মানুষের মণি নিয়ে যেসব অপারেশন করেছি, সেগুলি সবই ভীষণ

ভালভাবে জোড়া লেগেছে। শতকরা চৌষট্টিজনের অপারেশন সার্থক হয়েছে।

—তার অর্থ এই নয়, আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন। বিরুদ্ধ দলের ডাক্তাররা বললেন—তার প্রধান কারণ হল আপনি ভাল করে অপারেশন করেননি। যেগুলো ভালভাবে অপারেশন করেছেন, সেগুলো ঠিক হয়েছে, যেগুলো করতে পারেননি, সেগুলো জোড়া লাগেনি।

ডাক্তার ফিলাটভ্ কোন উত্তর দিলেন না। উত্তর দেবার সময় এখনও আসেনি। এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা করতে হবে, আরও অনেক রোগীর অপারেশন করতে হবে, তারপর এক সিদ্ধান্তে পৌঁছুন যাবে।

২৯৮১ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফিলাটভের পরীক্ষার সুযোগ অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। হাসপাতালের দরজায় অন্ধ সৈনিকের ভিড়। গোলাগুলির আঘাতে তাদের চোখের মণি নষ্ট হয়ে গেছে। স্বচ্ছ মণি অস্বচ্ছ হয়ে গেছে বলেই তারা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। অস্বচ্ছ মণি অপারেশন করে বাদ দিয়ে স্বচ্ছ মণি লাগিয়ে দিলে চোখদুটো আবার আগের মত ভাল হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে সৈনিকেরা দলে দলে হাসপাতালের দরজায় ভিড় করেছে। তারা লোকমুখে শুনেছে ডাক্তার ভি. পি. ফিলাটভ্ এই ধরনের অপারেশনে বিশেষ পারদর্শী।

মৃতের সংখ্যাও অগণিত! মৃত সৈনিকেরা যেখানে সেখানে পড়ে আছে। তাদের তুলে নিয়ে কবর দিয়ে চলেছেন মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। ফিলাটভ্ এ সুযোগ ছাড়লেম না। যে সব সৈনিকদের মৃত্যু ঘটেছে অন্য কারণে, কিন্তু চোখ দুটি ভাল আছে, তাদের চোখের মণি কেটে নিয়ে ঠাণ্ডায় তুলে রাখলেন ডাক্তার ফিলাটভ্। যে সব ব্যক্তি দু ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছে, তাদের মণি কেটে নিয়ে জমিয়ে রাখলেন ডাক্তার ফিলাটভ্।

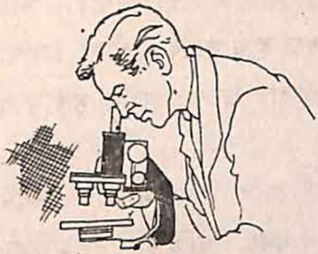
সেই জমানো মণি দিয়ে অপারেশন শুরু করলেন অন্ধ সৈনিকদের।

অপারেশন করার সময়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন ফিলাটভ্। যে মণিগুলো কেটে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লাগাতেন, সেগুলো জোড়া লাগত না, কিন্তু যে মণিগুলো কয়েকদিন ঠাণ্ডায় রেখে ব্যবহার করতেন, সেগুলো অনায়াসে জোড়া লেগে যেত। ফিলাটভ্ আরও পরীক্ষা করলেন। অনেকদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন কম পক্ষে সাতদিন ঠাণ্ডায় রেখে দিলে কোষগুলির সজীবতা বাড়ে। তিনি ঘোষণা করলেন কোষগুলি ঠাণ্ডার মধ্যে কমপক্ষে সাতদিন রেখে দিলে কোষের মধ্যে অতিসজীবতা সৃষ্টি হয়, এই অতিসজীবতার নাম বায়োজেনিক ষ্টিমুলেটরস্।

দীর্ঘদিনের পরীক্ষার ফল ডাক্তার ফিলাটভ্ কাগজে প্রকাশ করতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে। তিনি বিশ্বসমাজকে জানালেন মৃত ব্যক্তির কোন অংশ কেটে নিয়ে ২ থেকে ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রেখে দিলে একসপ্তাহের পর সেই অংশে অতিসজীবতার সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে এই অংশ আবার সজীব ত্বকের মতই ব্যবহার করে এবং জীবিত মানুষের কোন ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে আপনা থেকেই জোড়া লেগে যায়। এর জন্যে কোন সেলাইয়ের দরকার হয় না। এই অংশ ক্ষত অংশের সঙ্গে জোড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে আপনা থেকেই জুড়ে যায় এবং ক্ষত স্থান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

ফিলাটভের প্রবন্ধমালা বিশ্বের চারদিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল এবং চিকিৎসক জগৎ সেই মনীষীর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে লক্ষ লক্ষ রুগ্ন মানুষকে সুস্থ করে তুললেন।

পৃথিবীখ্যাত রুশবিজ্ঞানী প্রফেসর ভি. পি. 'ফিলাটভের পদ্ধতির পরবর্তী কালে আরও উন্নতি হয়েছে কিন্তু চিকিৎসকসমাজ আজও এই টিস্যু থেরাপি চিকিৎসার জনক ফিলাটভকে স্বীকার করে থাকেন।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ আট

না ! এতো সে রোগ নয় !

রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া রোগের আসল কারণ আবিষ্কার করে অমর হয়ে গেলেন। কলকাতায় যে সব সৈন্যরা ছিল, তারা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। রোনাল্ড রস যতদিন না ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট আবিষ্কার করেছেন, ততদিম আমাদের মতই ইংরেজদের ধারণা ছিল, দুর্গন্ধময় জলাশয়ের দূষিত বাতাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করলে সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসে। এই ভূতুড়ে জ্বর আর ছাড়তে চায় না। কারুর একদিন বাদে বাদে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর আসে, কারুর বা দু'দিন বাদে আসে, কিন্তু আসে ঠিক। কেউ ধরতে পারে না কেন আসে। ফোর্ট উইলিয়মের ডাক্তার রোগীদের আলাদা করে পাঠিয়ে দেন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে প্রথমে রোগীর রক্ত টেনে নেন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক রোনাল্ড রস, তারপর তাদের খাইয়ে দেওয়া হত কুইনিনের বড়ি। কেউ কেউ সারতেন, আবার অনেকে মারা যেতেন এই রোগের প্রকোপে। ইটালীর অধিবাসীরা এই রোগের নাম দেন ন্যালেরিয়া। আমাদের দেশের মতই ইটালীতেও অনেক জলাশয় আছে, যেখানের বাতাস দূষিত। ম্যালো কথার বাংলা অর্থ দূষিত এবং এরিয়া কথার অর্থ বাতাস। দূষিত বাতাস-এর মতই ইংরিজীর ম্যালো আর এরিয়া কথার সন্ধি করে নাম হয়েছে ম্যালেরিয়া।

বৃটিশ সৈন্যরা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসতে

ভয় পেতেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। একবার যদি এ রোগ ধরে, আর ছাড়তে চাইবে না। শরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্য হয়ে যাবে। প্লীহা ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে, তারপর একদিন রক্তশূন্যতার জন্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

—না। এ ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তার লিশ্‌ম্যান্ ফোর্ট উইলিয়াম-এর সৈন্যব্যারাকে রাউণ্ড দেবার সময় চিন্তিতভাবে মন্তব্য করলেন—এ ম্যালেরিয়া নয়? তাহলে এ আবার কী ভূতুড়ে রোগ রে বাবা? ডাঃ লিশ্‌ম্যানের সহকারী ডাঃ উইলিয়াম বেশ ভয়ার্তভাবে বললেন—হুঁ। চিন্তিতভাবে লিশম্যান্ জবাব দিলেন—আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তোমার কথার কি জবাব দেব?

লিশ্‌ম্যান্ পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটু জোরের সঙ্গে বললেন—তবে হলফ করে বলতে পারি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়।

—কিন্তু ম্যালেরিয়ার মতই এ রোগেও তো প্লীহা বড় হয়। সহকারীর মনে সংকটের উদয়।

—কথাটা বলেছো মিথ্যে নয়, কিন্তু দেখো উইলিয়াম, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এ রোগে সারা দেহ, বিশেষ করে মুখ কেমন কালীবর্ণ ধারণ করে। রোগীরা ক্রমশঃ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে যায়। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, ম্যালেরিয়া কুইনিন খাওয়ালেই ভাল হয়ে যায়, কিন্তু এ রোগে তা হয় না।

যুক্তি অকাট্য। উইলিয়াম আর তর্ক না করে শুধু বলল—তাহলে এ রোগটা কি রোগ?

—আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ রোগ একেবারে অন্য রোগ কক্ষণো ম্যালেরিয়া নয়। তবে কি রোগ এক্ষুণি বলতে পারব না।

—আপনি এত জোর দিয়ে কেন বলছেন স্যার যে, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়? উইলিয়াম বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—বেশ। চল। কোয়ার্টার্সে গিয়ে আলোচনা করব। লিশ্‌ম্যান উত্তর দিলেন। উইলিয়াম আর কোন প্রশ্ন করল না। নিঃশব্দে গুরুর সঙ্গে হাঁটতে লাগল। লিশ্‌ম্যান্ কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফকে গোপনে নির্দেশ দিলেন, এই কালরোগে যদি কোন সৈনিক মারা যায়, তার দেহ যেন পার্ক স্ট্রীটের সিমেট্রিতে সমাধি দেওয়া না হয়, গোপনে তার দেহ যেন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—দ্যাট্স্ রাইট্ ডক্টর। সেনাপতি সশ্রদ্ধভাবে জানালেন।

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে বেরিয়ে লিশ্‌ম্যানের ফিটন্ রাজপথ ধরে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল। গড়ের মাঠের দক্ষিণে পি. জি. হাস-পাতালের লাগোয়া ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স। কোয়ার্টার্সের চত্বরে এসে ফিটন্ গাড়ি দাঁড়াল। লিশ্‌ম্যান্ ও উইলিয়াম গাড়ি থেকে অবতরণ করে কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বেতের ইজি-চেয়ারে উপবেশন করলেন। মিসেস লিশ্‌ম্যান্ নিজের হাতে তিন কাপ চা তৈরি করে ট্রের ওপর সাজিয়ে বারান্দার টেবলের ওপর রেখে, নিজে একটি চেয়ারে বসে, ওঁদের আলোচনায় যোগ দিলেন।

—দেখো উইলিয়াম, আমি রোনাল্ডের মত পৃথিবী-বিখ্যাত নই, কিন্তু আমি এ বিষয়ে ব্যাটিস্টার সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে প্রায় নিশ্চিত হয়েছি।

—কিসে নিশ্চিত হয়েছ? মিসেস লিশ্‌ম্যান্ প্রশ্ন করলেন।

—এই কালাজ্বর সম্পর্কে।

—ও গড! মিসেস লিশ্‌ম্যান্ ভয়ার্তভাবে বললেন—কি ভয়ানক রোগ। একবার এ রোগ হলে আর নিস্তার নেই।

—এখানকার নেটিভ্‌রাও তাই বলেন।

লিশ্‌ম্যান্ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন—ইউ নো উইলিয়াম! দিজ্ নেটিভ্‌স কল্ গড অফ ডেথ্ অ্যাজ্ যম অর কাল।

মিসেস লিশ্‌ম্যান্ বললেন—হ্যাঁ, হামি নেটিভদের সঙ্গে কথা

বোলেছি। উহারা গড অফ ডেথকে যম বলে। সামবডি কল্‌স্ অ্যাজ্ কালা।

—অ্যাণ্ড ফিবার ইজ্ জ্বর, সো ডেথ ফিবার ইজ্ কালাজ্বর (Kala-azar)।

লিশ্‌ম্যান্ চিন্তিতভাবে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন—আমি বলছি কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়া একেবারে আলাদা রোগ। আমি ব্যাটিস্টা গ্রাসিকে এ সম্পর্কে চিঠি লিখেছিলাম। সে জানিয়েছে, ইটালীতে কখনো এ ধরনের রোগ হয় নি এবং সে কখনও এই রোগ দেখে নি।

—ব্যাটিস্টা কে? মিসেস লিশ্‌ম্যান্ জিজ্ঞাসা করলেন।

লিশ্‌ম্যান্ গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালেন—অ্যান্ আনফরচুনেট সায়ান্টিস্ট্ অফ্ ইটালী। রস যেমন কলকাতায় ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের রিসার্চ করেছে, ঠিক তেমনি ব্যাটিস্টা ইটালীতে করেছে। তার জীবনের চরম দুর্ভাগ্য, তার আবিষ্কারের ঠিক এক বছর আগে রোনাল্ড ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট্ আবিষ্কার করেন। রোনাল্ড আজ পৃথিবী-বিখ্যাত, কিন্তু ব্যাটিস্টার নাম কেউ জানেও না।

তিনজনেই চুপচাপ। ব্যাটিস্টার মর্মান্তিক দুঃখ যেন তিনজনের মনই স্পর্শ করেছে। নিঃশব্দে তিনজনে চা-পান করতে লাগলেন।

অল্পক্ষণ পরে উইলিয়াম কথা বলল। সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে এ রোগ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

—যতক্ষণ না পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছি, ততক্ষণ সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে হলফ করে বলতে পারি, এ রোগ ম্যালেরিয়া নয়।

—তবে এ কি রোগ? মিসেস লিশ্‌ম্যান্ জিজ্ঞাসা করলেন।

—সঠিকভাবে এক্ষুণি বলতে পারছি না। আগে কিছু রোগীর দেহ পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করে দেখি, তারপর আমার সঠিক সিদ্ধান্ত দেব।

চা-পান শেষ হয়ে গেল। উইলিয়াম বিদায় অভিবাদন জানিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিল।

মিসেস লিশ্‌ম্যান একটু ভয় পেয়ে বললেন—ইণ্ডিয়াতে হাজার রকমের বিদঘুটে রোগ আছে। এখানে থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে। চল, আমরা লণ্ডনে চলে যাই।

ডক্টর লিশ্‌ম্যান্ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—নো। আই ওয়াণ্ট্ টু সী দি এণ্ড্ অফ ইট। রস বলছে, এ রোগ এক রকমের ম্যালেরিয়া, রজার্সও তাই বলছে। অবশ্য ম্যান্‌সন্ জানিয়েছেন, তাঁর মতে এ ম্যালেরিয়া নয়।

লিশ্‌ম্যান্ একটু থেমে গম্ভীরভাবে বললেন—আমরা কখনও হার মানিনি। আজও মানব না।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল। নানাদিক থেকে রোগী আসছে। সাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল ১৭৭০ সালে, কিন্তু তখন কোন ভারতীয়, এমন কি কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অধিকার ছিল না প্রবেশ করার। ধীরে ধীরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চিকিৎসার অধিকার দেওয়া হল, কিন্তু কোন ভারতীয়কে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের প্রধানতম অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা হল।

দমদম ফিভার, বর্ধমান ফিভার, কালাজ্বর যে যেমন খুশী নামে ডাকছে এই ভয়ংকর রোগকে, কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারছে না রোগীকে। ডাক্তার লিশ্‌ম্যান্ এবং ডাক্তার রোনাল্ড রসের মধ্যে মতবিরোধ। রস বলছেন, এই রোগ এক রকমের ম্যালেরিয়া, লিশ্‌ম্যান্ বলছেন কক্ষনো নয়। এ রোগ সম্পূর্ণ আলাদা রোগ।

দমদম জ্বরে মারা গেলেন জনৈক সৈনিক। লিশ্‌ম্যানের নির্দেশমত তাঁর দেহ নিয়ে আসা হল হাসপাতালে। লিশ্‌ম্যান্ তাঁর যকৃৎ এবং

প্লীহা কেটে বার করে নিলেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন ল্যাবোরেটারীতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তিনি পাগলের মত পরীক্ষা করে চলেছেন। অণুবীক্ষণের নীচে প্লীহার টুকরো নিয়ে, যকৃতের অংশ নিয়ে দেখে চলেছেন।

—উইলিয়াম, এই দেখ। একদিন নির্জন ল্যাবোরেটারীতে মধ্যরাত্রে চিৎকার করে উঠলেন লিশ্‌ম্যান।

মাইক্রোস্কোপ্ থেকে মুখ তুলে দেখলেন ল্যাবোরেটারী নির্জন। কেউ কোথাও নেই। লিশ্‌ম্যান্ পাগলের মত আনন্দে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন পেয়েছি—আমি পেয়েছি। রোনাল্ড ভুল বলেছে। আমি ঠিক বলেছি।

তারপর নির্জন ল্যাবোরেটারীতে বসে লিশ্‌ম্যান্ তাঁর ডায়রীতে লিখলেন—যে সৈনিক দমদম ফিভারে মারা গিয়েছিল, তার প্লীহা পরীক্ষা করে আমি জীবাণু দেখতে পেয়েছি। জীবাণুগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এগুলো দেখতে ক্ষুদে ক্ষুদে ডিমের মত। মাপে আন্দাজ ২ থেকে ৪ মাইক্রোন লম্বা এবং ১ থেকে ২ মাইক্রোন চওড়া। এগুলোর নাম—নাম—কি নাম দেব?

পরদিন প্রত্যূষে লিশ্‌ম্যান্ রোনাল্ড রস এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের ডেকে এনে তাঁর আবিষ্কারের কথা বললেন।

রস মাইক্রোস্কোপের ওপরে চোখ লাগালেন, তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখে বললেন—তুমিই জয়ী হয়েছ লিশ্‌ম্যান্। আমি ভুল বলেছিলাম। কালাজ্বরের জীবাণু অন্য, ম্যালেরিয়ার জীবাণু থেকে কালাজ্বর হয় না।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লিশ্‌ম্যান্ প্রমাণ করলেন, কালাজ্বর মাছির কামড়ে হয়। এক রকমের মাছি, যার নাম Phlebotomus argentipes, সেই মাছির মধ্যে কালাজ্বরের জীবাণু থাকে। সেই মাছি যখন মানুষকে কামড়ায়, সেই কামড়ের সঙ্গে জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢুকে যায়, আর কালাজ্বর হয়।

১৯০৩ সালে দিল্লীর ডাক্তার ডোনোভ্যান জানালেন দিল্লী-ফোড়া নামে যে ভয়ংকর রকমের রোগ হচ্ছে, তাও এক রকমের কালাজ্বর। আমি এইসব রোগীদের প্লীহা পরীক্ষা করে কালজ্বরের জীবাণুর মতই এক রকমের জীবাণু পেয়েছি। সে জীবাণুর নাম আমি জানি না।

বিশেষজ্ঞরা একমত হয়ে এই জীবাণুর নাম দিলেন লিশ্ম্যানিয়া-ডোনোভ্যানি (Leishmania Donovani)।

শহর কলকাতা তখন আজকের মত ছিল না। এই শহরে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৭ সালে। সেই হাসপাতালের নাম ছিল জেনারেল হাসপাতাল এবং শুধু ইউরোপীয়ানদের চিকিৎসা হত এই হাসপাতালে।

সিপাহীদের জন্য সাময়িকভাবে একটা অস্থায়ী হাসপাতাল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হল বর্তমানের খিদিরপুর অঞ্চলে। ১৭৬৮ সালে এখন যেখানে এস. এস. কে. এম. হাসপাতাল সেইখানে একখণ্ড জমি কিনে বৃটিশ সরকার একটি হাসপাতাল গড়ে তুললেন ১৭৭০ সালে শুধু মাত্র ইংরেজদের চিকিৎসার জন্যে। ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে, ভারতীয়দের চিকিৎসার জন্যে তখনও কলকাতা শহরে কোন হাসপাতাল ছিল না।

জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বেসরকারী হাসপাতাল তৈরি করা হল উত্তর কলকাতার গরাণহাটা অঞ্চলে। এই হাসপাতালে ভারতীয় অভারতীয় সকলেরই চিকিৎসা হত। সাধারণ মানুষের জন্যে সাধারণ মানুষের টাকায় গড়ে উঠল একটি হাসপাতাল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই হাসপাতালে এত রোগী হতে শুরু করল যে, এই ছোট্ট বাড়িতে হাসপাতাল চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে ১৭৯৬ সালে এই হাসপাতালকে ধর্মতলায় একটা বড় বাড়িতে উঠিয়ে আনা হল। কিন্তু এই বাড়িতেও

হাসপাতাল হিসেবে চালানো সম্ভব হল না। রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ওই বাড়িটিতেও স্থান অকুলান হওয়ায় কলকাতার উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে অনেকখানি খোলা জায়গা কিনে একটি বড় হাসপাতাল করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৮৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মেয়ো মেমোরিয়াল গ্রান্ট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটি সুন্দর হাসপাতাল গড়ে তোলা হল গঙ্গার পাড়ে। মেয়ো সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে হাসপাতালটির নাম রাখা হল মেয়ো হাসপাতাল।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সাব্যস্ত করলেন, কলকাতায় পাশ্চাত্ত্য দেশের মত মেডিকেল শিক্ষা দরকার। নেটিভ্‌দের মধ্যেও অনেক মেধাবী ছাত্র আছে, যারা সুযোগ পেলে অসাধারণ ভাল চিকিৎসক হতে পারে। বেন্টিঙ্ক সাহেব ছ জনের একটি কমিটি গঠিত করলেন, সেই কমিটিতে অন্যান্যদের সঙ্গে বাবু রামকমল সেনও ছিলেন। ১৮৩৩ সালে বেন্টিঙ্ক এই কমিটি গঠিত করে, অনুসন্ধানের পর যথাযথ রিপোর্ট দিতে বললেন। কমিটি ১৮৩৪ সালে রিপোর্ট দাখিল করলেন এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী গভর্নমেণ্ট একটি সরকারী মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যে সময়ে রোনাল্ড রস, লিশ্‌ম্যান্, রজার্স কালাজ্বর ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারে ব্যস্ত, যে সময়ে এঁদের নাম পৃথিবীখ্যাত, সেই সময়ে একটি নেটিভ্ বাঙালীর ছেলে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. ডি. পাস করলেন।

আশ্চর্য মেধাবী ছাত্র। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বর্ণে বর্ণে তা ফলে গেছে। এই বাঙালীর সন্তান ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাস করলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পরের বছরেই প্রেসিডেন্সি কলেজ

থেকে এম. এ. পাস করলেন এবং রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন।

বাঙালীর ছেলে এম. এ. পাস করার পর ডাক্তারী পড়তে ঢুকলেন। আশ্চর্য মেধাবী, আশ্চর্য আত্মভোলা ছাত্র। পড়তে পড়তে সে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যায়। তার মনে কিসের চিন্তা কেউ জানে না ; কিন্তু সে কিছুতেই স্বস্তি পায় না।

লিশ্‌ম্যান-ডোনোভ্যান আবিষ্কার করলেন কালাজ্বরের জীবাণু। রোনাল্ড রস আবিষ্কার করলেন ম্যলেরিয়ার জীবাণু। তবু—তবু কেন তার শান্তি নেই ? আনন্দ নেই ?

সবাই যখন তাকে প্রশ্ন করেন, সে উত্তর দেয়—কেন শান্তি হবে ? ম্যালেরিয়ার ওষুধ সিঙ্কোনা কুইনিন অনেকদিন থেকেই ছিল। কেন সে রোগ হত লোকে বুঝতে পারত না ; কিন্তু ম্যালেরিয়া হলে তাকে সারাবার পথ চিকিৎসকদের জানা ছিল। কালাজ্বরের বেলায় ঠিক তার উল্টো। এ রোগ কেন হত তাও লোকে জানত না, কি করে এ রোগ সারানো যায়, তাও কেউ জানে না। কি লাভ শুধু কেন এই রোগ হয় জেনে ?

ছাত্রটির কথার গুরুত্ব সকলেই বুঝতে পারলেন। ছাত্রটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—এ রোগ আমাদের দেশেই হয়, তাই এর ওষুধ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, কারণ এই রোগে আমাদের দেশের মানুষই মারা যায়।

ছাত্রটি চিকিৎসাজগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ১৮৯৮ সালে এম. বি. পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় মেডিসিন ও সার্জারীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। মেডিকেল কলেজের প্রথম সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ছিলেন ডাঃ এইচ. এইচ. গুডইভ্। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি স্মৃতিপদক দেওয়া হয় সেরা ছাত্রকে। যার নাম গুডিভ পদক। সেই পদক পেলেন ছাত্রটি। এ ছাড়াও সে অধিকার করল ম্যাকলাউড পদক।

বাঙালী ছাত্রটি সসম্মানে এম. বি. পাস করল। তারপর পাস করল এম. ডি. ১৯০২ সালে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রটি শারীরতত্ত্বে পি. এইচ. ডি. সম্মানের অধিকারী হল।

ছাত্রজীবনের অবসানে কর্মজীবনের শুরু। ছাত্র এখন আর ছাত্র নেই। নানান চিন্তায় অহরহ মগ্ন এক চিকিৎসক। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে তিনি চলে গেলেন ঢাকায়। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্যাথলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক হয়ে কাজে যোগ দিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি কলকাতায় এসে ক্যামবেল মেডিকেল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক হলেন। কর্মজীবনে খ্যাতনামা চিকিৎসক হলেও মনের মধ্যে প্রতিক্ষণে সেই ক্ষোভ জেগে উঠতে লাগল। রোগীরা কালাজ্বরের আক্রমণে যখন অসহায় হয়ে তাঁর কাছে আসে চিকিৎসার প্রত্যাশায়, তিনি কিছুই করতে পারেন না। অসহায়ভাবে তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকেন।

তিনি যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, ঠিক তেমনি রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনায় এবার রসায়নশাস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

একটির পর একটি ওষুধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করেন, আর ল্যাবোরেটারীতে লিশ্‌ম্যানিয়া-ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর প্রয়োগ করেন। অদ্ভুত কঠিন জীবন এই জীবাণুগুলোর। সিঙ্কোনা হজম করে দেয়, কুইনিনে কোন ফলই হয় না।

এসব ওষুধে কোন ফল হবে না, কারণ এই জীবাণুগুলো ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইটের মত নয়।

আবার গবেষণা। আরও বিষাক্ত ওষুধের প্রয়োজন। যেমন কঠিন ধাতের জীবাণু, তেমনি বিষাক্ত ওষুধের প্রয়োজন।

ম্যান্‌সন্ বলেছিলেন কালাজ্বরের জীবাণু ট্রিপানোসোম্ গ্রুপের কোন রোগ। তিনি ঠিক কথা বলেন নি, লিশ্‌ম্যান্ তা প্রমাণ করে

দিয়েছেন, কিন্তু চিকিৎসায় হয়ত ওই ধরনের ওষুধ কাজে লাগতে পারে।

আর্সেনিক দিয়ে ওষুধ তৈরি করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। প্রয়োগ করলেন কালাজ্বরের জীবাণুর ওপর। না, কোন ফল পাওয়া গেল না।

হতাশ হলেন না। একের পর এক খুঁজে যেতে হবে। একদিন না একদিন সার্থক হয়ে উঠবেই এই তপস্যা। এ বিশ্বাস তাঁর আছে।

আরও বিষাক্ত পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে হবে। অ্যান্টিমনি। অ্যান্টিমনি দিয়ে ওষুধ তৈরি করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। প্রয়োগ করলেন লিশ্‌ম্যানিয়া-ডোনোভ্যানি জীবাণুর ওপর। আশ্চর্য! জীবাণুগুলো ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নির্জীব হয়ে গেল জীবাণুগোষ্ঠী।

পেয়েছি!

বৈজ্ঞানিক বিড় বিড় করে আপনমনেই উচ্চারণ করলেন, পেয়েছি! সন্ধান পেয়েছি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক যা করতে পারেন নি, বাঙালী বৈজ্ঞানিক তা করতে পেরেছেন।

কিন্তু সমস্যা আছে। এই ওষুধ এত বিষাক্ত যে মানুষ তা সহ্য করতে পারছে না। আবার গবেষণা শুরু করলেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রক্রিয়ায় নানা রকম ওষুধ তৈরি করতে লাগলেন বাঙালী চিকিৎসক।

একটি ওষুধ তিনি অবশেষে তৈরি করলেন। ওষুধটি ইনজেকশন দিলে রোগী সহ্য করতে পারে, অথচ কালাজ্বরের জীবাণুও মারা যায়। এই ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত রোগীরা তাঁর ওষুধে চিকিৎসিত হয়ে আবার সুস্থ জীবন লাভ করল।

দিকে দিকে ধন্য ধন্য রব উঠল। ১৯২০ সালে এই ওষুধ আবিষ্কার করলেন বাঙালী বৈজ্ঞানিক। ভারত সরকার ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সম্মানে নাইট উপাধি দান

করলেন। বাঙালীর ছেলে ১৯৩৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন-এর সভ্যরূপে নির্বাচিত হলেন।

এই বাঙালী মহাবৈজ্ঞানিক ১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী দেহত্যাগ করেন।

অসামান্য মেধাবী, অসাধারণ বাঙালী কৃতিপুরুষ হলেন স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের নাম ইউরিয়া স্টিবামাইন, কালাজ্বরের অমোঘ ওষুধ।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ নয়

লোকে বলে পাগল ডাক্তার।

এলোমেলো কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল মাথায়। চোখে চশমা, বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। সব সময়ে নিজের চিন্তায় বিভোর। কি ভাবছেন কেউ বলতে পারেন না।

—ডাক্তার ব্যান্টিং কি সত্যই পাগল হয়ে গেলেন? দিনরাত কেবল কুকুরের অপারেশন করছেন। একটি ছাত্র বলল।

আমেরিকার টোরেন্টো হাসপাতালের একটি ঘরে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা করছিলেন ডাক্তার ব্যান্টিং-এর বিষয়। ডাক্তার ব্যান্টিংকে শ্রদ্ধা করে সবাই। এত বড় শারীরতত্ত্ববিদ্ সারা দেশে আর কেউ

আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কাছে কিন্তু কেউ সহজে পড়াশুনা করতে যেতে চায় না। তাঁর পাণ্ডিত্য এত গভীর যে, তার কূলকিনারা পাওয়া মুশকিল। তিনি হজমের বিষয় পড়াতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করলেন, গ্রন্থিরসের পরিচ্ছেদে। কেউ যদি হেসে জিজ্ঞাসা করেন—হজমের ব্যাপারে গ্রন্থিরস কোত্থেকে এল স্যার ?

ব্যান্টিং রেগে ওঠেন। রাগতস্বরে বললেন—যা বোঝো না, সে বিষয় কথা বোলো না। শরীরের একটা অঙ্গের সঙ্গে আর একটা অঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটাকেই বিচার করা যায় না।

ছেলেরা কথা বলে না। অনেক মাষ্টারমশায়ও ব্যান্টিং-এর কথার প্রতিবাদ করেন না। ব্যান্টিং যা বলেন, শুনে যান। যতটুকু বিশ্বাস করা দরকার করেন, বাকীটা ভুলে যান।

ইদানীং ব্যান্টিং-এর কাজকর্ম কেমন অন্যরকম হয়ে পড়েছিল। তিনি কুকুরের পেট চিরে অপারেশন করে প্যান্‌ক্রিয়াস্‌-গ্রন্থি পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি পেটের মধ্যে পাকস্থলীর পেছন দিকে অবস্থিত। প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থির মধ্যস্থল থেকে একটি নালী অন্ত্রের ভিতর যুক্ত হয়েছে। সেই নালীপথ দিয়ে একরকমের রস অন্ত্রের মধ্যে যায়, তারই প্রভাবে যথাযথ হজম হয়। ব্যান্টিং-এর নিশ্চিত ধারণা প্যান্‌ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থির মধ্যে এমন কিছু আছে, যার প্রভাবে শরীরের হজম ও পুষ্টি সাধারণভাবেই হয়।

—ডাক্তার ব্যান্টিং পাগল হয়েছেন এ কথা মনে করছ কেন ? বেস্ট্‌ নামের আর একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করল। বেস্ট্‌ ডাক্তার ব্যান্টিং-এর ভক্ত এবং একনিষ্ঠ সেবক।

—পাগল না হলে এই ধরনের কাজ করেন ; পূর্বোক্ত ছাত্র জন পালটা প্রশ্ন করল।

—কাজটা কি শুনি আগে ?

ব্যান্টিং বলছেন, প্যান্‌ক্রিয়াস গ্রন্থি শরীরের পুষ্টিসাধন করে, অথচ

যে কটা কুকুরকে উনি অপারেশন করেছেন, সবকটিই শুকিয়ে মারা গেছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বেস্ট্ এ কথার উত্তর সরাসরি উত্তর দিতে পারল না, তবু একটু জোরের সঙ্গে বলল—না, না—আমি বিশ্বাস করি না স্যার পাগল হয়ে গেছেন।

—ঐ বিশ্বাস নিয়েই থাক। ব্যঙ্গের সুরে জন জবাব দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেস্ট্ মনমরা হয়ে বসে থাকে। জন যে কথা বলল তা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু তার মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ডাক্তার ব্যান্টিং একদিন অভাবনীয় কিছু আবিষ্কার করবেন।

বেস্ট্ ধীর পায়ে ব্যান্টিং-এর ঘরে গেল। ব্যান্টিং একমনে কাজ করছিলেন, বেস্ট্ ঘরে ঢুকতেই রাগতস্বরে বললেন—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

বেস্ট্ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে কোন কথা বলতে গেলেই ব্যান্টিং চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবেন। বেস্ট্-এর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল ব্যান্টিং-এর। তিনি কোমল স্বরে বললেন—একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাব।

বেস্ট্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাস্টারমশায়ের দিকে। ব্যান্টিং একটা কুকুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—সাত নম্বর কুকুরকে মনে আছে ?

বিস্মিত দৃষ্টিতে বেস্ট্ কুকুরটির দিকে তাকিয়ে রইল। মাসখানেক আগে কুকুরটির অপারেশন হয়েছিল। তারপর থেকেই ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ! সে আবার আগেকার মত স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। তার যে কোন অপারেশন হয়েছিল একথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

—এ অসম্ভব কি করে সম্ভব হল স্যার ? বেস্ট্-এর বিস্মিত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়, কেউ জানে না। কোন পূতিই হয় না। ক্রমশঃ ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে। বার বার মূত্র ত্যাগ করতে হয়। রক্ত পরীক্ষায় চিনির ভাগ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে যেতে একদিন জ্বর হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ডাক্তারদের ধারণা হজমের গোলমালে খাদ্যের পুষ্টি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে না, ফলে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! হজমের যত রকমের চিকিৎসা জান' ছিল সব করেও তাঁরা কোন সুরাহা করতে পারেননি, একটি রোগীকেও বাঁচাতে পারেননি। রোগ ধরা পড়বার কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীরা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অনেক সময় রোগ নির্ণয় করবার আগেই মৃত্যু ঘটে যায়।

ব্যান্টিং ঘোষণা করলেন—আমার তৈরি ওষুধে নিশ্চয়ই ওই ধরনের রোগ সেরে যায়। তোমরা নিজেরা এসে দেখে যাও, যে কুকুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল, আমার তৈরি ওষুধের ইনজেকশনে আবার মোটাসোটা হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে।

ব্যান্টিং-এর কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বেস্ট্ ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু ব্যান্টিং হাল ছাড়েন না। তিনি বেস্ট্‌কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এত অল্পে হতাশ হলে জীবনের কোন সাধনাই সার্থক হয় না।

বেস্ট্ নীরবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর ভবিষ্যতের আশায় বসে থাকে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস।

উত্তর আমেরিকার টোরান্টো শহরে তুষার পড়ছে। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাবার অবস্থা। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে

—বলব, তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। তবে এখন নয়। আমার সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হল বেস্ট্।

ডাক্তার ব্যান্টিং তাঁর গবেষণায় তন্ময় হয়ে গেলেন আরও গভীর-ভাবে। তিনি সর্বদাই ল্যাবোরেটারীতে গবেষণায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। কখন খান, কখন ঘুমোন কিছুই ঠিক থাকে না। তাঁর একমাত্র সাথী বেস্ট্। গভীর রাতে দু'চোখ ভেঙে ঘুম আসে বেস্ট্-এর, তবু অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে ব্যান্টিং-এর পাশে। তার অগাধ বিশ্বাস, ডাক্তার ব্যান্টিং নিশ্চয়ই অসাধ্যসাধন করবেন।

ডাঃ ব্যান্টিং যে বই খুঁজে আনতে বলেন, বেস্ট্ যেভাবেই হোক যোগাড় করে আনে। বই থেকে যে জায়গা দরকার বেস্ট্ খুঁজে মাষ্টার মশায়কে পড়ে শোনায়। বেস্ট্ আর ব্যান্টিং-এর মধ্যে আলোচনা চলে। বেস্ট্ আলোচনা করতে করতে যে জায়গায় ভুল করে ফেলে, ব্যান্টিং শুধরে দেন, আবার ব্যান্টিং যেখানে খটকা অনুভব করেন বেস্ট্ সরল করে দেয়। দুজনে মিলে একটি বিচিত্র জগৎ গড়ে তোলে, সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।

বছর খানেক পরে ব্যান্টিং একদিন বেস্ট্কে বললেন—দেখো বেস্ট্। এই যে ওষুধ তৈরি করলাম ল্যাবোরেটারীতে, এই ওষুধ দিয়ে পুষ্টিহীন রোগীকে সুস্থ সবল করে তোলা যাবে।

বিভ্রাট লাগল রোগী নিয়ে। কেউ ব্যান্টিং-এর চিকিৎসায় ভরসা পায় না। রোগীরা স্বচক্ষে দেখেছে একের পর এক কুকুর শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেছে ব্যান্টিং-এর কাছে। অন্য ধরনের চিকিৎসায় হয়তো আবার হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ব্যান্টিং-এর হাতে পড়লে মৃত্যু নির্ঘাত।

আমেরিকার এই অঞ্চলে হঠাৎ যেন রোগা হয়ে যাওয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে। প্রায়ই লোককে দেখা যায়, একটু বয়স হলেই ক্ষিদে বেড়ে যায় অস্বাভাবিক রকম। লোকে খায়ও প্রচুর,

পড়েছে ফায়ার প্লেসের চারপাশে। আগুন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

টোরান্টোর থম্পসন্ সংসারে কিন্তু শান্তি নেই। মৃত্যুর আশঙ্কা সামনে নিয়ে থম্পসন্ গৃহিণী মিসেস্ ডরোথী নিঃশব্দে কাঁদছেন আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। স্বামী মারা গেছেন। এক এক করে চার চারটি ছেলে অকালে মারা গেছে। কোন চিকিৎসাই তাদের ধরে রাখতে পারেনি। স্বামী ইদানীং একটু পরিশ্রম করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। মধ্যবিত্ত সংসারে যা সংগ্রহ করা সম্ভব, সবই যোগাড় করে স্বামীকে খাওয়াতেন ; কিন্তু তবু শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর একদিন হোঁচট খেলেন কাজ থেকে ফেরার পথে। আঙুলের ঘা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। সাধারণ ঘা ভেবে, সাধারণ চিকিৎসা করলেন ডাক্তারবাবুরা। ঘা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল, তার সঙ্গে জ্বরও শুরু হল। ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসায় কোন সুফল না পেয়ে হাসপাতালে ভরতি করে দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। হাসপাতালের ডাক্তারদের সামনে মিসেস্ থম্পসনের স্বামী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

অভিশপ্ত সংসার।

স্বামীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তিনটি ছেলে অকালে মারা গেল। সকলেরই সেই বিদকুটে রোগ। চিকিৎসকের অসাধ্য রোগ। কোন ভাবেই চিকিৎসকেরা সুরাহা খুঁজে পান না।

শেষ ছেলে লিওনার্ড থম্পসন্। চোদ্দ বছর বয়সেই সেই কালরোগ দেখা দিয়েছে। ক্লান্তি! ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে লিওনার্ড। লাল টকটকে চেহারা কয়েক মাসের মধ্যেই তামাটে হয়ে গেল। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। চোখ কোটরাগত। একটু জোরে হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়ছে। মিসেস্ ডরোথী মা। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন মৃত্যু তার কালো দু'খানি হাত নিয়ে, লিওনার্ডের

ওপর নেমে আসছে। মৃত্যুর জয় অবধারিত। মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই।

ডিসেম্বরের শীতে সারা কানাডা স্থবির হয়ে গেছে। এবার বরফ পড়ছেও অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। এই ঠাণ্ডায় ডরোথীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ছেলের দিকে যতবার তাকাচ্ছেন, ততবারই বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক করে উঠছে। চোখের তারার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছেন ডরোথী। যে কোনদিন লিওনার্ডের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

—মা। লিওনার্ড মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে বলল--আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। একটু বিষ এনে দাও।

ডরোথী চোখ মুছলেন। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—কি কষ্ট হচ্ছে বাবা?

—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

ডরোথী উঠে বসলেন। ছেলের মাথা কোলের ওপর নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ওর বাবা, ওর দাদারা সবাই এক এক করে চলে গেছে। যাবার সময় সকলেই একই রকম উপসর্গের কথা বলেছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার পরই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তারপরে আর সে জ্ঞান আসেনি।

—আর একটু বাতাস করো জোরে জোরে।

ডরোথী লিওনার্ডের মাথা বালিশের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অক্সিজেন না দিলে বাতাসের কষ্ট যাবে না। ডরোথী জানেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বৃথা। সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তা হোক, তবু তিনি যাবেন; এভাবে নিশ্চেষ্টভাবে মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে বসে থাকা যায় না।—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বরের শেষ রাতে লিওনার্ড থম্পসনকে টোরান্টো জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হল। ডাক্তাররা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন। লিওনার্ডও সেই কালরোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগের চিকিৎসা বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অসহায় চিকিৎসকের সামনে রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কেউ কিছুই করতে পারে না।

ডাক্তারেরা লিওনার্ডের রক্ত পরীক্ষা করে চমকে উঠলেন। রক্তের মধ্যে যেখানে আশি থেকে একশ কুড়ি থাকে চিনির পরিমাপ, সেখানে লিওনার্ডের রক্তে পাঁচশ মিলিগ্রাম হয়ে গেছে; তার মানে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও পাঁচ গুণ।

—আমার লিওনার্ড বাঁচবে তো? ডরোথী ডাক্তারদের দিকে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাংশুমুখে একজন ডাক্তার উত্তর দিলেন—আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমরা চিকিৎসা করতে জানি, প্রাণ দিতে জানি না মা। মৃত্যুকে ঠেকানো আমাদের সাধ্য নেই।

—আমি একবার দেখতে চাই। ব্যান্টিং ডাক্তারদের মিটিং-এ বললেন—আমি লিওনার্ডকে একবার দেখব।

ডাক্তারদের মধ্যে অনেকে বললেন—কি হবে দেখে?

—আপনারা যা করতে পারেননি, আমি হয়তো পারব।

—কি করে? ডাক্তারেরা প্রশ্ন করলেন।

—সে কথা এখন বলব না। যদি সফল হই তখন নিজেই সব বুঝিয়ে দেব।

ডাক্তাররা নিমরাজী হলেন।

ব্যান্টিং ধীর গম্ভীর ভাবে লিওনার্ডের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন। লিওনার্ড আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে। বিছানার সঙ্গে লেপটে গেছে। কণ্ঠার হাড় প্রকট হয়ে উঠেছে। শরীরে আর

কোথাও মাংস নেই বললেই চলে। হাড়ের ওপর শুধু চামড়ার আবরণ। সারা শরীরে হিমশীতল ঘাম। বিছানার পাশে একটি টুলের ওপর ডরোথী বসে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দয়া করে ডরোথীকে ছেলের কাছে থাকতে অনুমতি দিয়েছেন।

ব্যান্টিং বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ডরোথী উঠে দাঁড়ালেন। পরম আশ্বাসে তাঁর দিকে তাকালেন। এতদিন পরে ডরোথী একজন নতুন চিকিৎসককে দেখলেন, যিনি হতাশ না হয়ে চিন্তিতভাবে রোগীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ডরোথী নমস্কার করে সরে যেতেই ব্যান্টিং তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা! আপনার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছি।

ডরোথী বিস্মিত! তাঁর কাছে কিসের অনুমতি চাইছেন, ব্যান্টিং-এর মত স্বনামধন্য চিকিৎসক?

—বলুন? মৃদুকণ্ঠে ডরোথী জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমি একটা ওষুধ তৈরি করেছি। আপনার ছেলের ওপর পরীক্ষা করতে চাই।

ডরোথীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। পরীক্ষা! পরীক্ষার ফল যদি ব্যর্থ হয়ে যায়! তাঁর সবে ধন নীলমণি হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্যে!

ডরোথীকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাক্তার ব্যান্টিং বললেন—আপনি অনুমতি না দিলে আমি ইনজেকশন দিতে পারব না। একটু থেমে ব্যান্টিং আবার বললেন—আপনার সংসারের সবাই এক এক করে চলে গেছে। কাউকে ধরে রাখতে পারেননি। একেও পারবেন না। আমাকে চেষ্টা করতে দিলে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে।

—আপনি যা খুশি করুন, শুধু আমার লিওনার্ডকে বাঁচান। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ওর জীবন থেকে সব আলো যেন নিবে না যায়। ডরোথী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

—নার্স! ব্যান্টিং গম্ভীরভাবে নার্সকে ডাকলেন।

নার্স পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—এঁকে বাইরে নিয়ে যাও। ডরোথীকে দেখিয়ে আদেশ দিলেন।

—না। ডরোথী মাথা নেড়ে সজোরে আপত্তি জানালেন— যদি কিছু ঘটে, আমার সামনেই ঘটুক।

—বেশ। আপনি তাহলে ওই দূরের টুলটিতে চুপ করে বসে দেখুন, কি করি?

ডরোথী নিঃশব্দে দূরের টুলে বসলেন আশা-আশঙ্কা মেশানো মন নিয়ে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টোরান্টো জেনারেল হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার ঘরের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ালেন। বেস্ট্ ব্যান্টিং-এর তৈরি ওষুধ আর ইনজেকশন-এর সিরিঞ্জ নিয়ে ব্যান্টিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল। ব্যান্টিং পরিমাণমত ওষুধ ইনজেকশন-এর সিরিঞ্জে ভরে লিওনার্ডের শরীরে দিয়ে দিলেন।

১১ই জানুয়ারী, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রথম ইনজেকশন পড়ল লিওনার্ডের শরীরে। ডাক্তারেরা সবাই অবাক্ বিস্ময়ে দেখলেন লিওনার্ডের শরীরে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। ডরোথী চোখ বুজে বসে ঈশ্বরের উপাসনা করছিলেন। জীবনের শেষ অবলম্বন যেন তিনি কেড়ে না নেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন তিনি। লিওনার্ড ঘুমিয়ে পড়েছে, তার চোখমুখের ক্লান্তি অনেকখানি কেটে গেছে। পরিষ্কার হয়ে আসছে শরীরের গ্লানি। জীবন যেন মৃত্যুর ক্লেদ নিজের হাতে মুছিয়ে দিলেন।

ব্যান্টিং সহর্ষে বলে উঠলেন—দেখেছো, লিওনার্ড কেমন ভাল হয়ে উঠছে। আমার ওষুধে নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে। তোমরা ওর ব্লাডসুগার দেখ, নিশ্চয়ই কমতে আরম্ভ করেছে।

অন্য ডাক্তারেরা বললেন—আমরা ব্লাডসুগার পরীক্ষা করেছি, কিন্তু আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে ব্যাপারটা।

—বেশ। বিকেলবেলায় কনফারেন্স্ ডাকা হোক। ব্যান্টিং নির্বিকারভাবে জবাব দিলেন।

বিকেলবেলায় ঘরভরতি ডাক্তাররা বসে। ব্যান্টিং বক্তার চেয়ারে, পাশে দাঁড়িয়ে একনিষ্ঠ সহকারী সি. এইচ. বেস্ট্। ব্যান্টিং সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—লিওনার্ডের যে অসুখ করেছে, তার নাম ডায়াবিটিস মেলিটাস্। মূত্র দিয়ে শরীরের অধিকাংশ চিনি বেরিয়ে যায় বলেই ওই নাম দেওয়া হয়েছে। মেলিটাস্ কথাটার মানে মধু।

কিন্তু কেন? কেন হঠাৎ চিনি বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করল? আমি প্রথমে কুকুর চিরে দেখলাম কি করে শরীরের পুষ্টি অন্ত্র থেকে লিভারে যায়, কারণ লিভারই আমাদের শরীরে পুষ্টি প্রদান করে। দেখলাম লিভার থেকে একটি নালী আর প্যানক্রিয়াস্ থেকে একটি নালী অন্ত্রে আসছে। প্রথমে লিভারের নালী, পরে প্যান্‌ক্রিয়াসের নালী কেটে দিলাম। তাতে হজমের গোলমাল হল, কিন্তু ব্লাডসুগারের কোন পরিবর্তন ঘটল না। তারপর প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি কেটে বাদ দিয়ে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে হুহু করে চিনির ভাগ রক্তে বেড়ে গেল।

ব্যান্টিং থামলেন। ঘরের সকলে বিস্মিত, নিস্তব্ধ। ওপাশ থেকে একজন সন্দিগ্ধচিত্তের ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—তাতে কি সাব্যস্ত হল?

ব্যান্টিং বিরক্তচিত্তে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা সহজ জিনিস বুঝতে যে এত দেরি লাগে জানতাম না।

ডাক্তারটি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে না বোঝা পর্যন্ত ছাড়ছি না।

ব্যান্টিং ঘরের সমস্ত ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদেরও কি তাই মত?

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ। একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যেতে পারে। ব্যান্টিং কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—বেশ। সমস্ত ব্যাপারটাই আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

'প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডসুগার হুহু করে বেড়ে যেতে লাগল। অথচ প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থির নালী (duct) পথ

বন্ধ করে দিলে সুগার বাড়ে না। এ থেকে আমার বিশ্বাস হল, প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থির ভেতরে আরও কোন রস সৃষ্টি হয়, যা শরীরের চিনির ভাগ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখে।

এমন সময় টোরান্টো জেনারেল হাসপাতালের প্যাথোলজিস্ট্ ঘরের মধ্যে ঢুকে চিৎকার করে উঠলেন—আশ্চর্য! আশ্চর্য ব্যাপার—।

—কি? সকলেই প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন। ব্যান্টিং শুধু মিটিমিটি হাসছেন। বেস্ট্ নীরবে নাটকের দর্শক হয়ে বসে আছে।

লিওনার্ডের রক্ত তিনবার পরীক্ষা করলাম। অনেক অনেক কমে গেছে চিনির পরিমাণ।

—আমি জানতাম। নির্বিকার স্বরে জবাব দিলেন প্রফেসর ব্যান্টিং। ব্লাডসুগার না কমলেই আমি আশ্চর্য আর হতাশ হয়ে পড়তাম।

সকলে সবিস্ময়ে, শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাক্তার ব্যান্টিং-এর দিকে তাকালেন। ব্যান্টিং ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন—আমি একের পর এক কুকুর কেটেছি। তাদের প্যান্‌ক্রিয়াস্ গ্রন্থি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছি। তারপর এক অবিশ্বাস্য পদার্থ খুঁজে পেয়েছি।

ঘরের সবাই পাথরের মত নিথর নিস্তব্ধ। বাইরে বরফ পড়ছে। নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। মৃদু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে শুধু।

ব্যান্টিং চোখ বুজে বলে যেতে লাগলেন।

—আমি দেখতে পেলাম, প্যান্‌ক্রিয়াসের মধ্যে আরও একরকমের কোষ আছে। যেখান থেকে এক রকমের হরমোন্ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে গ্লুকোজ শরীরে নিয়মিত সঞ্চয় হয় আর খরচ হয়। গ্লুকোজ বা চিনি শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে ঢুকে জ্বালানী শক্তি দান করে, ফলে এনার্জি সৃষ্টি হয়। এই হরমোন্ না থাকলে বা কম

থাকলে গ্লুকোজ লিভারে সঞ্চিত হতে পারে না। আবার কোষের মধ্যে গিয়েও জ্বালানী শক্তি প্রদান করতে পারে না। সমস্ত চিনি বা গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে জমা হয়ে থাকে।

এই হরমোন্ আমি ল্যাবোরেটারীতে তৈরি করেছি। যাদের শরীরে এই হরমোন্ নেই বা কম আছে, তাদের যদি আমার তৈরি হরমোন্ পরিমাপমত ইনজেকশন দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিক লোকের মতই আবার তারা চলাফেরা করতে পারবে।

আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। লিওনার্ডকে যদি নিয়মিত ভাবে এই হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে ও সেরে উঠবে।

—আমরা আপনাকে অনুমতি দিলাম। সমস্ত ডাক্তার একসঙ্গে বলে উঠলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন লিওনার্ডের শরীরে ব্যান্টিং-এর তৈরি হরমোন ইনজেকশন দেওয়া শুরু হল। দেখতে দেখতে লিওনার্ডের রক্তের চিনির পরিমাপ স্বাভাবিক মাত্রায় নেমে এল। ধীরে ধীরে শরীরের পুষ্টি বাড়তে লাগল ; মৃত্যুর কালো ছায়া মুখের ওপর থেকে সরে গেল, আবার জীবনের রক্তাভ আলো জেগে উঠল সারা দেহে। শ্রান্ত, ক্লান্ত লিওনার্ড থম্পসন্ মৃত্যুর দরজা থেকে সরে এসে আবার জীবনের আনন্দময় স্পন্দন অনুভব করল। হাসিতে ভরে উঠল ডরোথী থম্পসনের মুখমণ্ডল। মাসকয়েক পরে ছেলেকে সুস্থ সবল করে বাড়ি ফিরে গেলেন ডরোথী থম্পসন্। যাবার সময় প্রণাম করে গেলেন প্রফেসর ব্যান্টিংকে।

—উহুঁ! শুধু আমায় করলে হবে না। একেও করতে হবে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেস্ট্-এর দিকে তাকিয়ে প্রফেসর ব্যান্টিং বললেন—এমন একনিষ্ঠ সহকারী না পেলে আমি ইনসুলিন্ আবিষ্কার করতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

আজও লক্ষ লক্ষ নরনারী, যাঁরা ডায়াবিটিস্-এ ভুগছেন, তাঁরা ইনসুলিন্ নিয়ে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ইনসুলিন্ হরমোনের আবিষ্কর্তা এফ. জি. ব্যান্টিং এবং সি. এইচ. বেস্ট্‌কে প্রণাম জানাচ্ছেন।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ দশ

—ডাক্তারবাবু, আমি এভাবে বাঁচতে চাই না। মেয়েটি কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল।

—কি হয়েছে ?

ডাক্তার আইভারসন্ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন।

মেয়েটি আইভারসনের দিকে সরাসরি তাকাল। তার মুখ ভরতি বসন্তের দাগ। হয়তো এককালে সুন্দর ছিল, বর্তমানে মারীগুটিকার দাগের জন্য কদাকার হয়ে গেছে।

ডাক্তার আইভারসন্ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন, তারপর ধীরস্বরে বললেন—তুমি কয়েকদিন পরে এস। এর মধ্যে ভেসে দেখি কি করতে পারি।

মেয়েটি চোখ মুছতে মুছতে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসন্।

ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। মানুষের বিজ্ঞান কি এতই সীমিত যে তার তার হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় ?

কোন মেয়ের মুখে কুৎসিত কোন দাগ দেখলে তাঁর পাঁজরাগুলো টনটনিয়ে ওঠে, একটা যন্ত্রণার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে বুকের পাঁজরাগুলো থেঁতলিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়। তাঁর একমাত্র মেয়ে রেবেকা, ইইনিভারসিটির ছাত্রী ছিল। রসায়নশাস্ত্র নিয়ে রিসার্চ করত। ফুলের মত সুন্দর দেখতে। জন্-এর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা। জন্ অধ্যাপক ছিল। তারা দুজনে যখন আইভারসনের সামনে এসে দাঁড়াত, আইভারসনের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। তাঁর মনে হত, পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তাঁর সামনেই রয়েছে।

হঠাৎ একদিন।

রেবেকা একমনে ল্যাবোরেটরীতে কাজ করছে, হঠাৎ একটা রাসায়নিক ফ্লাস্ক ফেটে গিয়ে সমস্ত অ্যাসিড ছড়িয়ে পড়ল। তপ্ত অ্যাসিডের খানিকটা ছিটকে রেবেকার মুখের ওপর পড়ল। যন্ত্রণায় একটা চিৎকার করে রেবেকা সেই মুহূর্তেই জ্ঞানহীন হয়ে টুল থেকে লুটিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে ডাক্তার ছুটে এল। আইভারসন্‌কে খবর দেওয়া হল। হাসপাতাল থেকে আইভারসন্ ছুটে গেলেন। রেবেকাকে হাসপাতালে ভরতি করা হল। দীর্ঘ দুমাস ধরে তার চিকিৎসা করে, তাকে সুস্থ করে তোলা হল।

কিন্তু!

রেবেকার মুখ বীভৎস হয়ে গেল। ফুলের মত সুন্দর মুখের ওপর ছোপ ছোপ কালো দাগ। রেবেকার মুখের দিকে তাকানো যায় না। বাবা হয়ে আইভারসন্ তাকাতে পারছেন না; অন্য লোকের তো কথাই নেই।

জন্ একদিন দেখতে এসেছিল। সে ফিরে গিয়েছিল, তারপর জানিয়েছিল, সে রেবেকাকে জীবনসঙ্গিনী করতে অক্ষম।

আইভারসন্ কিছু বলতে পারেননি। রেবেকা নিজের মুখ আয়নায় দেখে আঁতকে উঠেছিল। সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে

বাবাকে বলেছিল।—পারো না বাবা, আমার মুখটা আবার আগের মত করে দিতে ?

অস্থিরভাবে আইভারসন্ ঘরময় পায়চারি করেছিলেন। একটা অসহায় যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর নীল হয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রেবেকা কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাবাকে বলে গেল—ল্যাবোরেটারীতে যাচ্ছি।

সেই শেষ যাওয়া।

দুপুরবেলায় আইভারসনের হাসপাতালে ফোন এল শীগ্‌গির তিনি যেন ল্যাবোরেটারীতে আসেন। ফোন পেয়েই আইভারসন্ ছুটে গেলেন ল্যাবোরেটারীতে। রেবেকার রিসার্চরুমে প্রবেশ করে দেখলেন একটা লম্বা টেবিলের ওপর রেবেকাকে শোয়ানো হয়েছে। সাদা ধবধবে একটা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা। আইভারসন্ চাদর সরিয়ে মুখ দেখে পাথর হয়ে গেলেন।

বিষের প্রতিক্রিয়ায় রেবেকার মুখ নীল হয়ে গেছে।

তবু—তবু—।

বাবার মন! অবশ হাতখানি তুলে নাড়ী দেখলেন্। নিজের আঙুলের শিরার স্পন্দন যেন রেবেকার নাড়ীর স্পন্দন বলে মনে হয়।

স্টেথোস্কোপ্ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গতি পরীক্ষা করলেন। নিস্তব্ধ নিঝুম। চরম অভিমানে রেবেকা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

রেবেকার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক টুকরো চিঠি বেরিয়ে এল। জলভরা চোখে আইভারসন্ পড়ে দেখলেন ঃ

'বাবা,

কুৎসিত চেহারা নিয়ে পৃথিবীকে কুৎসিত করে তোলার অধিকার আমার নেই, তাই বিদায় নিলাম—

রেবেকা—'

ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসন্!

চেম্বারের জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর দুচোখে জল। রেবেকার মত এই মেয়েটিও একটা অসহায় চাউনি নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে জানে না, চিকিৎসক তার চেয়েও অসহায়।

ডাক্তার আইভারসন্ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কি করা যায়? করা যাবে কি?

নিশ্চয়ই যাবে। বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

১৯৫২ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জার্মান-ইংরেজের যুদ্ধের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডস্টীনার রক্ত সম্বন্ধে আবিষ্কার করেছেন, রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ আছে, এ, বি, এবি. এবং ও গ্রুপ।

পৃথিবীতে হইচই পড়ে গেছে। সার্জারীর উন্নতি হয়েছে। যে রোগী আগে বাঁচত না, বর্তমানে রক্তদানের কল্যাণে সেই রোগী নির্বিবাদে বেঁচে উঠে চিকিৎসককে আশীর্বাদ করে গেছে।

আইভারসন্ চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে কুৎসিতদর্শন চামড়াকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক করতে পারেন। অনেকক্ষণ ধরে আইভারসন্ এলোমেলোভাবে মোটরে ঘুরে বেড়ালেন, তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

বাড়িতে একা একা শুয়েও ওই একই চিন্তা করে যেতে লাগলেন; কি করে ক্ষত চামড়াকে আবার ভাল করে তুলতে পারেন। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিজেও জানতে পারেননি।

পরদিন সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যখন চেম্বারে গেলেন, দেখলেন সেই মেয়েটি চুপচাপ বসে আছে। আইভারসনকে দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠল। আইভারসন্ বসবার নির্দেশ দিতে সে বসল।

মেয়েটি বসে বলল—কিছু ভেবেছেন কি ?

চিন্তিত স্বরে আইভারসন্ বললেন—তোমার কথাই চিন্তা করছি মা।

তারপর একটু থেমে আইভারসন্ আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এত উতলা হয়েছো কেন মা ?

—হবো না ? মেয়েটির চোখদুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল। সে বলল—আমি আগে এত কুৎসিত দেখতে ছিলাম না। বছর পাঁচেক আগে আমার বসন্ত হয়, তারপর থেকেই মুখ এমনি হয়ে যায়।

একটু থেমে মেয়েটি আবার বলতে লাগল—আমি একটা আফিসে চাকরি করি। এখন যে কাজ করি তা একটা ছোট্ট ঘরে মুখ বুজে করতে হয়। কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না। বেশ ভালই ছিলাম।

আমার কাজ দেখে আমার মনিব খুব খুশী হয়ে আমাকে প্রমোশন দিয়েছেন। মাইনে অনেক, কিন্তু সমস্যা হল, এ কাজে সকলের সঙ্গে দেখাশোনা করতে হয়। আমি সেকাজ করতে পারবো না। আমি তার চেয়ে আত্মহত্যা করব। এই কুৎসিত মুখ নিয়ে কি করে লোক-সমাজে বার হব ? কোম্পানির খরিদ্দাররাই বা আমাকে দেখে কি ভাববেন ?

মেয়েটি কথা বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আইভারসন্ স্তব্ধ হয়ে সবকথা শুনলেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন—একটা কথা শুনে রাখো মা। তোমার বয়সী আমার একটি মেয়ে ছিল। তারও ঠিক এমনিভাবে মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল। সে পৃথিবীর ওপর অভিমান করে চলে গেছে। বুড়ো বাপটার কথা একবার ভাবলোও না……।

কথা শেষ করতে পারলেন না। একটা অব্যক্ত কান্নায় কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটি যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল—আপনার মেয়ে

ঠিকই করেছেন। পৃথিবীর অনুকম্পা, দয়া, সহানুভূতি, ঘৃণা কুড়িয়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমিও ভাবছি—

—না, না। ব্যাকুলকণ্ঠে প্রেসটন্ আইভারসন্ চিৎকার করে উঠলেন।—এভাবে তোমাদের আমি মরতে দিতে পারি না।

—তাহলে সুস্থভাবে বাঁচবার অধিকার দিন।

—দেবো। আইভারসনের কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—দেবো। তবে আমায় সময় দিতে হবে।

—বেশ। মেয়েটি ক্লান্তস্বরে বলল—এক মাস সময় দিলাম। এক মাস পরে আবার আমি আসবো।

আইভারসন্ মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—একমাস অনেক সময়। তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমি একটা উপায় বার করবোই।

—একমাস পরেও যদি নিরাশ হয়ে ফিরি ;—

মেয়েটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আইভারসন্ বললেন—তাহলে তোমার আগে আমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।

মেয়েটি আর কোন কথা না বলে নমস্কার করে বিদায় নিল।

যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ—

পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষ শান্তি চায়, নীল আকাশ প্রাণ ভরে দেখতে চায়, মন খুলে হাসতে চায়।

রণক্লান্ত আহত সৈনিকের দল আইভারসনের চেম্বারে এসে ভিড় করে। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডল। সুন্দর সুন্দর যুবক কদাকার হয়ে গেছে স্প্লিন্টারের আঘাতে।

আইভারসন্ পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে ক্ষত চামড়া আবার নতুন করে তোলা যায়।

একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে চিন্তিত মনে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পথের পাশে দেখলেন কয়েকটি রেড ইণ্ডিয়ান একটা গ্রাম্য লোকের কাছে

বসে হাতে উলকি আঁকছে। কি খেয়াল হল আইভারসন দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকগুলি উলকি আঁকিয়ে নিয়ে খোস-মেজাজে গল্প করতে করতে চলে গেল।

আইভারসন্ দাঁড়িয়ে রইলেন। উলকির লোকটি আইভারসন্কে মোটা খদ্দের ভেবে আপ্যায়ন করে বলল—আসুন বাবু, উলকি পরবেন, নতুন নতুন নকশা!

আইভারসন্ কাছে এসে বললেন—উলকি পরতে পারি এক শর্তে!

—বলুন বাবু, কি শর্ত?

—যদি আবার উলকি তুলে দিতে পার তবেই।

—এ আর এমন কি শক্ত? লোকটি বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল—কিন্তু বাবু, যদি উঠিয়েই ফেলবেন, তাহলে পরছেন কেন?

—এর জবাব আজ নয়। আর একদিন দেব।

—বেশ। বসুন আপনি।

আইভারসন্ পথের ওপর বসে পড়লেন। লোকটি তার যন্ত্রের সাহায্যে আইভারসনের দু হাতে উলকি এঁকে দিল, তারপর জিজ্ঞাসা করল—কোন্ হাতেরটা উঠিয়ে দিতে হবে?

আইভারসন্ বাঁ হাত এগিয়ে দিলেন। পরম বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, লোকটি তার থলি থেকে একখণ্ড সিরিশ কাগজ বার করে উলকির ওপর ঘষতে লাগল। যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠল আইভারসনের মুখ, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। নীরবে তার কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলেন। ঘষতে ঘষতে উলকির নীল দাগ যখন মিলিয়ে গেল, লোকটি একটা ন্যাকড়া বার করে হাতে জড়িয়ে দিয়ে বলল—তিনদিন পরে খুলে দেখবেন উলকি উবে গেছে!

তিন দিন পরে আইভারসন্ ন্যাকড়া খুলে দেখলেন সত্যিই কোন উলকির দাগ নেই। জায়গাটায় কচি নূতন চামড়া গজিয়েছে।

বিদ্যুতের মত আইভারসনের মাথায় খেলে গেল লোকটি উলকির

দাগ যতটা চামড়ার নীচে গেছে ততটা ঘষে উঠিয়ে দিয়েছে। নতুন চামড়া যখন গজিয়েছে স্বাভাবিক চামড়াই গজিয়েছে।

সেই মুহূর্তে ডান হাতের উলকির খানিকটা কেটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। চামড়ার সাতটি স্তর আছে। উলকির দাগ চামড়ার দ্বিতীয়, বড় জোর তৃতীয় স্তর ভেদ করেছে। সিরিশ কাগজের সার্জারীও তৃতীয় স্তর পর্যন্ত গিয়েছে; ফলে নতুন চামড়া গজাবার বেলায় স্বাভাবিক চামড়া গজিয়েছে।

প্রেসটন্ আইভারসনের পরীক্ষামূলক অপারেশন শুরু হল। পরিষ্কার বিশুদ্ধ সিরিশ কাগজ দিয়ে সৈন্যদের মুখের ক্ষতস্থানগুলি ঘষে ঘষে তুলে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। তিনদিন পরে বুকের মধ্যে অসীম ভয় আর বিস্ময় নিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলে আইভারসন্ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। স্বাভাবিক চামড়া গজিয়েছে, যে চামড়ায় পূর্বের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। চামড়ার ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক দাড়ি গোঁফ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে।

নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন আইভারসন্। একের পর এক অপারেশন করে চললেন তিনি। রোগীকে অজ্ঞান করে সিরিশ কাগজ দিয়ে ক্ষত ঘষে বিলুপ্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দেন। চামড়া যখন গজায় তখন আগের দাগের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না।

প্লাস্টিক সার্জারী।

পরবর্তী কালের সার্জনরা এই অপারেশনের নাম দিলেন প্লাস্টিক সার্জারী!

এক মাস যেদিন শেষ হবে, সেদিন সেই মেয়েটি আইভারসনের চেম্বারের দরজায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল—আমি এসেছি।

দু হাত বাড়িয়ে আবেগের স্বরে আইভারসন্ বললেন—এসো মা। আমি রেবেকার সময়ে যা করতে পারিনি, তোমার জন্যে তাই করবার জন্যে বসে আছি।

মেয়েটির অপারেশন করলেন আইভারসন্। তিনদিন পরে যখন ব্যাণ্ডেজ খুললেন গোলাপী রঙের স্বাভাবিক চামড়া দেখা গেল। আগের ক্ষতের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

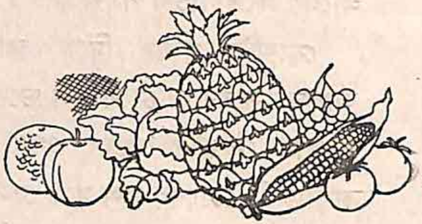
মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রেসটন্ আইভারসনের দু'চোখে জল ভরে এল। জলভরা আবছা দৃষ্টিতে বৃদ্ধ ডাক্তার মেয়েটির মুখের ওপর রেবেকার মুখ দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললেন। অ্যাসিস্ট্যান্টরা অধ্যাপকের চোখের জল মোছা দেখে বাঁকা ঠোঁটে মৃদু হাসলেন। সাতদিনের দিন মেয়েটি ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল। একমাস পরে চিঠি লিখে জানাল নতুন কাজ সে গ্রহণ করেছে। মালিক তার কাজে খুব আনন্দিত। তার অনেক টাকা মাইনে হয়েছে। হয়ত খুব শীগ্‌গির তার বিয়ে হবে। এ সবের জন্য ডাক্তার প্রেসটন্ আইভারসনের ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।

—না, না, না—।

থরথর করে বৃদ্ধের হাত কেঁপে উঠল। চিঠিটা থরথরিয়ে উঠল। আইভারসন্ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন—না, না—এর জন্যে আমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত নয়। ধন্যবাদ যদি কাউকে দিতে হয় তাহলে সেই উলকিওলাকে দিতে হয়।

আইভারসন্ ধন্যবাদ দেবার জন্যে উলকিওলার কাছে গেলেন। দেখা পেলেন না। উলকিওলা কখনও এক জায়গায় বসে না। আইভারসন্ এক এক করে সমস্ত জায়গা খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না সেই উলকিওলাকে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ধন্যবাদ দিলেন কাল্পনিক উলকিওলাকে যে নিজের অজান্তে বর্তমান চিকিৎসা-জগতে প্লাস্টিক সার্জারীর সূচনা করে দিয়ে গেল।

আবিষ্কারের কাহিনী ॥ এগার



সর্বনাশ !

আবার সেই সর্বনাশা রোগ !

রক্তাল্পতা—ক্রমশঃ রক্তের লোহিত কণিকাগুলো মরে যাচ্ছে। লোহিত কণিকা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়, আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বহন করে ফুসফুসের ভিতর দিয়ে শরীরের বাইরে বার করে দেয় ।

লোহিত কণিকাগুলির অপমৃত্যু ঘটছে। কেন ঘটছে এতকাল কেউ বুঝতে পারেনি, জানতে পারেনি। এই রোগের কোন চিকিৎসাও জানা নেই চিকিৎসক সমাজের। অসহায় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় রোগী রোগিণীর অকালমৃত্যু। কিছুতেই মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। দু বছর—বড় জোর তিন বছর বাঁচে। তার মধ্যে লোহিত কণিকাগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সার্থকতা আর থাকে না। অক্সিজেনের অভাবে রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

—এভাবে হেরে যেতে আমি রাজী নই। মিনট্ বললেন মারফিকে।

—যেভাবেই হোক এই রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে।

—কি করে বাঁচাবে ? মারফি জবাব দিলেন—এই রোগকে

পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া কেন বলে ? চিকিৎসা নেই বলেই বলে। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া—ভয়ংকর ধরনের অ্যানিমিয়া—সর্বনাশা অ্যানিমিয়া—বিপজ্জনক অ্যানিমিয়া। একবার এই ধরনের অ্যানিমিয়া হলে আর রক্ষে নেই।

—জানি—জানি, সব জানি। তবু আমি বাঁচাবার চেষ্টা করব। চিকিৎসাশাস্ত্রের কোথাও না কোথাও এর চিকিৎসার বিধান আছে। কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ডিস্‌গ্রেস্ ফর আস্।

জর্জ আর মিনট্ উত্তেজিতভাবে তাঁর বন্ধু উইলিয়ম পি মারফির সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁরা দুজনেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসকবিজ্ঞানী।

মাসের পর মাস তাঁরা সমস্ত রকমের জানা বিদ্যায় চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। যথাসময়ে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

একদিন একজন রোগী হাসপাতালে এলেন। মিনট্ তাঁর উপসর্গ শুনে রক্ত পরীক্ষা করে দেখলেন ভদ্রলোক পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া রোগে ভুগছেন।

—আমার কি হয়েছে ?

ম্লান হেসে মিনট্ জবাব দিলেন—তেমন কিছু নয়।

তারপর যথাযথ প্রেসক্রিপশন করে বললেন—এইসব ওষুধ খাবেন অন্ততঃপক্ষে তিন বছর। তারপর এসে বলবেন, কেমন থাকেন।

মিনট্ জানতেন তিন বছর পরে ভদ্রলোক আর এসে তাঁর উপসর্গের কথা বলতে পারবেন না। তার আগেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

—থ্যাঙ্ক ইউ। ভদ্রলোক সরলভাবে জবাব দিলেন। মিনট্ যা বলেছেন ভদ্রলোক সরলচিত্তে তাই বিশ্বাস করেছেন।

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর মারফি বললেন—এভাবে মিথ্যা কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।

—সত্যি কথা বলাটা খুব উচিত হত? অসহিষ্ণুকণ্ঠে মিনট্ জবাব দিলেন।—আমি জানি এক বছরের মধ্যে ভদ্রলোক নিশ্চিত-ভাবে মারা যাবেন।

তবু, সত্যি কথা বললে ভদ্রলোক মৃত্যুর আগে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি উইল করতে পারতেন।

মিনট্ কোন জবাব দিলেন না।

১৯২৬ সাল।

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ বছর পর। জর্জ মিনট্ এবং উইলিয়াম মারফি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে একই ভাবে কাজ করছেন। না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। অন্যান্য চিকিৎসকদের মত মিনট্ এবং মারফি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন। এলোপাতাড়ি ভাবে ওষুধ খুঁজে চলেছেন এই ভয়ংকর ব্যাধিকে রোধ করার জন্যে।

—গুড্ মরনিং—

মিনট্ মুখ তুলে তাকালেন। সামনে ভূত দেখার মত ভদ্র-লোককে দেখলেন; পাঁচ বছর আগে ভদ্রলোককে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার জন্যে ওষুধ দিয়েছিলেন।

—কি নাম আপনার?

মিনট্ সঠিক ভাবে জানার জন্যই প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পুরনো। একটি কার্ড বার করলেন। কার্ডটি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের। পাঁচ বছর আগে মিনট্ নিজেই কার্ডটি লিখে ভদ্রলোকের হাতে দিয়েছিলেন।

—আসুন আমার সঙ্গে।

মিনট্ ভদ্রলোককে হাসপাতালের ভেতর মারফির কাছে নিয়ে গেলেন। মারফিকে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলে বললেন—এঁর ব্লাড পরীক্ষা করে এক্ষুণি দেখ। আমি আসছি।

নিমট্ হাসপাতালের ওল্ড রেকর্ডরুমে ঢুকলেন, যেখানে রোগীদের রোগের ইতিবৃত্তের খোঁজ পাওয়া যায়। এইসব রেকর্ড-এর দায়িত্ব হাসপাতালের রেজিস্ট্রারের ওপর থাকে। মিনট্ রেজিস্ট্রারকে বললেন, পুরনো রেকর্ড দেখে ভদ্রলোকের রোগের বিষয় খোঁজ দিতে। আধ ঘন্টার মধ্যে রেজিস্ট্রার সমস্ত রেকর্ড বার করে মিনট্-এর হাতে দিলেন। মিনট্ পুরনো রেকর্ড-এর ওপর দেখলেন তাঁর নিজের হাতেই পরিষ্কার ইংরেজীতে লেখা আছে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া। রক্ত পরীক্ষার ফলও লেখা রয়েছে ঃ পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া।

মিনট্ পুরনো রেকর্ড হাতে মারফির কাছে ফিরে এলেন। মারফি রক্ত পরীক্ষা করেছেন ভদ্রলোকের। কোন দোষ নাই। কোন অ্যানিমিয়ার চিহ্ন নেই।

—না কোন দোষ নাই। রায় দিলেন মারফি—

—বাট্—পুরনো রিপোর্টগুলো দেখিয়ে মিনট্ জিজ্ঞাসা করলেন—এ অসম্ভব কাণ্ড ঘটল কি করে?

মারফি সমস্ত কাগজপত্র নিখুঁতভাবে দেখলেন, তারপর ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—কী ওষুধ খেয়েছেন?

—দূর্ মশায়! আপনাদের চিকিৎসা—চিকিৎসা সব বাজে। আমি মনের আনন্দে খেয়েছি আর ঘুরে বেড়িয়েছি।

—খেয়েছেন? আশ্চর্য হয়ে মিনট্ জিজ্ঞাসা করলেন—

—কি খেয়েছেন?

—কি আবার? মাংস, ডিম, রুটি, কারী—লিভার—যা খুশি।

—আপনি দয়া করে মাসে মাসে একবার দেখা করে যাবেন। মিনট্ বললেন।

—নিশ্চয়ই আসব। ভদ্রলোক একটু ঝাঁজের সুরে বললেন—আপনারা আমাকে রোগের কথা বলেননি, কিন্তু অন্য হাসপাতাল থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল আমার কি হয়েছে। আমি যে আর বছর খানেক বাঁচবো, তাও সবাই বলে দিয়েছিলেন। আমি কোন

চিকিৎসাই আর করিনি। শুধু পেট ভরে খেয়েছি আর ঘুমিয়েছি। পাঁচ বছর পরেও যখন বেঁচে আছি; আমি প্রত্যেকের কাছে গিয়েছি এবং দেখিয়ে এসে বলেছি—এই দেখুন আমি বেঁচে আছি।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

মিনট্ এবং মারফি আবার নতুন করে ভাবতে লাগলেন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসার কথা।

ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস করে মিনট্ ও মারফি ঠিক করলেন, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দিয়ে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা করবেন। ওঁরা ঘোষণা করলেন পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার রোগী রোগিণীদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন বিনামূল্যে। একে একে অনেক রোগী রোগিণী এসে জুটলেন, কারণ ইওরোপে এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।

মিনট্-মারফি এক একজন রোগীকে এক এক ধরনের খাদ্য খাইয়ে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সবিস্ময়ে দেখলেন যে সব রোগী লিভার খান, তাঁদের রোগ ধীরে ধীরে সেরে যাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন মিনট্-মারফি। লিভার! যকৃৎ। যকৃতের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু পুষ্টিকর পদার্থ আছে, যার প্রভাবে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার মত ভয়ংকর রোগও সেরে যায়। কি সে পদার্থ?

মিনট্-মারফি সেই পদার্থটির আবিষ্কার করতে পারেননি, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন যকৃতের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যার কল্যাণে পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার নিরাময় হয়।

রিসার্চ—রিসার্চ—রিসার্চ—

ইংলণ্ডের, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা অবিরাম রিসার্চ করে চলেছেন এই পদার্থটিকে খুঁজে বার করার জন্য। দেখা গেল যকৃতের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স্ জাতীয় অনেক পুষ্টিকর

প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে। কিন্তু এরা লোহিতকণিকার পুষ্টিসাধন করতে পারে না।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল এক রকমের কোবাল্ট কম্পাউণ্ড লিভারের মধ্যে আছে। এই কোবাল্ট্ কম্পাউণ্ড বিনষ্ট করে দিলে আর লিভারের কার্যকারিতা থাকে না। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াও সারে না। বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্তে এলেন যকৃতের মধ্যে বর্তমান কোবাল্ট কম্পাউণ্ডই হল অ্যান্টি পারনিসিয়াস ফ্যাক্টর। এই কোবাল্ট কম্পাউণ্ডের নাম দিলেন সায়ানোকোবালামিন্ (cyanocobalamin) অথবা ভিটামিন বি ১২।

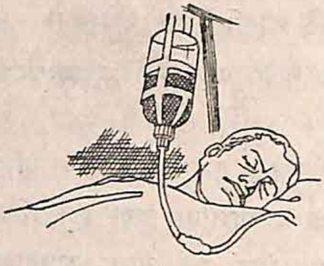
ভিটামিন বি ১২ লোহিতকণিকার সৃষ্টিতে প্রধান সহায়ক। ধীরে ধীরে ভিটামিন বি ১২ কে লিভার থেকে আলাদা করা হল, কিন্তু কিছুতেই এর সঠিক চরিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব হল না। আন্দাজে ভিটামিন বি ১১-এর ওজন ঠিক করা হতে লাগল।

১৯৫৫ সালে মিসেস ডরোথি ক্রোফুট্ হজ্কিন অক্সফোর্ড-এ ভিটামিন বি ১২-এর ওজন সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দিলেন। তিনি এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিন বি ১২-এর নিখুঁত মলিকিউলার বর্ণনা দিলেন। এই অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে মিসেস ডরোথি ক্রফোর্ড হজকিন্ ১৯৬৪ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। তিনি মহিলা রসায়নশাস্ত্র বিশারদদের মধ্যে তৃতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিতা হন।

ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। নরম্যান জলিফে, নরম্যান ওয়েজেল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে ভিটামিন বি ১২ শিশুদের পুষ্টি এবং শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানকালের চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিটামিন বি ১২ আবিষ্কার এক আশ্চর্য সংযোজন এবং বহু দুরারোগ্য রোগ এই ভিটামিনের সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়। প্রতিদিন ভিটামিন বি ১২ অতি সামান্য

পরিমাণেই লাগে। যাঁরা ওষুধ ব্যবহার করতে চান না, প্রতিদিন যকৃৎ খেলে রক্তাল্পতাজনিত রোগ বা পুষ্টিহীনতা জনিত রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ বার

যুদ্ধ! যুদ্ধ!!

একদিকে জার্মান জাপান অন্যদিকে শক্তিমান ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী। ইওরোপ, ইংলণ্ড আর আমেরিকার বিরুদ্ধে হের হিটলার নাৎসী বাহিনী নিয়ে উল্কার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

যুদ্ধ মানেই রক্তারক্তি! বোমার আঘাতে আহত হয়ে একের পর এক সৈন্য ক্যাম্প হসপিটালে আসছে। কারুর পা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে, কারুর হাত। কারুর বা পাঁজরা খসে পড়ে গেছে। অনেকে হাসপাতালে আসার আগেই স্ট্রেচারের ওপরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।

ক্যাম্পের ডাক্তার ল্যাণ্ডষ্টিনার ক্ষিপ্রহাতে রোগীদের চিকিৎসা করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে নার্স এলিজাবেথ যন্ত্রপুতুলের মত সাহায্য করে চলেছেন।

ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করছেন, কিন্তু আশা নেই। নতুন তাজা প্রাণের যুবক সৈনিকের দল! আহত অবস্থা থেকে আর তারা সুস্থ হতে পারছে না। বোমার আঘাতে হাঁটু থেকে পা খসে পড়ে গেছে।

রক্ত ঝরছে! এত রক্ত ক্ষয় হয়েছে, যে তার পূরণ না হলে বাঁচা সম্ভব নয়। ডাক্তার রক্ত বন্ধ করতে পারেন। ক্ষতস্থানকে সেলাই করে আবার নতুন করে দিতে পারেন, কিন্তু যে রক্ত শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, তাকে পূরণ করে দিতে পারেন না।

তাজা প্রাণের যুবক সৈনিক! রক্তের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ডাক্তারের নিস্ফল প্রয়াস, নার্সের ব্যর্থ সেবাযত্ন।

—রক্ত, রক্ত চাই এলিজাবেথ! ল্যাণ্ডস্টিনার চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—যদি ওইসব আহত সৈনিকদের শরীরে তাজা রক্ত দিতে পারতুম, ওরা নিশ্চয়ই বেঁচে উঠত।

—রক্ত! এলিজাবেথ আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিল—রক্ত কোথায় পাবেন স্যার?

ল্যাণ্ডস্টিনার কোন উত্তর দিলেন না। চিন্তিত মনে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। যাবার সময় আদেশ দিয়ে গেলেন, নতুন পেশেণ্ট এলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে।

নিজের ঘরে ঢুকে বই খুলে বসলেন। রক্ত নিয়ে ভূতপূর্ব চিকিৎসকরা কি গবেষণা করেছেন, তার সন্ধান পাবার জন্যে। নেই, তেমন কিছু তথ্য নেই, যার ওপর নির্ভর করে ল্যাণ্ডস্টিনার গবেষণা করতে পারেন। রোগীর শরীরে রক্ত দান সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা আছে। রক্ত দিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। রক্ত শরীরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজন অভিযোগ করেছেন ডাক্তার ইচ্ছে করে রোগীকে হত্যা করেছেন। তাঁর শাস্তি দেওয়া হোক। চিকিৎসকের শাস্তি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, রক্ত দিয়ে যেন কোন চিকিৎসা না করা হয়।

না, না, না—

ল্যাণ্ডস্টিনার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন—না। এ ভুল। রক্ত দিয়ে কি চরিত্র বদলানো যেতে পারে?

আগেকার ডাক্তারদের ধারণা ছিল, রক্ত দিয়ে মানুষের চরিত্রের ধারাকে বদলানো যেতে পারে। পাগলের চিকিৎসা করা হত রক্ত দিয়ে। ভেড়ার রক্ত, ঘোড়ার রক্ত, নানারকম জন্তু-জানোয়ারের রক্ত মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত। তারপর কেউ ভাল হত, কেউ বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

বই বন্ধ করে দিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার।

না। রক্তের প্রধান কাজের কথা কেউ তেমনভাবে ভাবেননি। ল্যাণ্ডস্টিনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন রক্ত শুধু রক্ত নয়। লাল রক্তের মধ্যে জলীয় ভাগ আছে, কঠিন ভাগ আছে। জলীয় ভাগকে বলা হয় প্লাজমা। এই প্লাজমা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন, শরীরের পুষ্টিসাধন করে। কঠিন পদার্থের মধ্যে কণিকাসমষ্টি আছে। লোহিতকণিকা, শ্বেতকণিকার দল, রক্তের প্রকৃত কাজ করে। শ্বেতকণিকা শরীরের মধ্যে জীবাণু আক্রমণ হলে প্রতিরোধ করে, আর লোহিতকণিকার মধ্যে লাল রঙের একটি পদার্থ আছে। এই পদার্থের নাম হিমোগ্লবিন্। হিমোগ্লবিন্ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শেষ সীমায় বহন করে নিয়ে যায়। অক্সিজেন ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচতে পারে না। শরীরের প্রত্যেকটি কোষ কাজ করে, সেই কাজ অক্সিজেনের মাধ্যমে হয়। অক্সিজেন বহন করার একমাত্র উপায় হিমোগ্লবিন্। হিমোগ্লবিন্ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু অক্সিজেন নয়। শরীরের কোষ অক্সিজেনের সাহায্যে কাজ করে, অক্সিজেন পুড়ে ছাই হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়ে যায়। সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লবিনের সাহায্যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে ফুসফুসে চলে যায়।

হিমোগ্লবিন্!

রক্তের মধ্যে যে হিমোগ্লবিন্ আছে, সেই হিমোগ্লবিন্ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। শরীরে রক্ত দিলে, তৈরি হিমোগ্লবিন্ শরীরে প্রবেশ করবে আর শরীরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ল্যাণ্ডস্টিনার গবেষণা শুরু করলেন। অবাক্ হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন পশুপাখির রক্তের হিমোগ্লবিন্ আর মানুষের হিমোগ্লবিন্ একেবারে আলাদা রকমের। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করলে অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, কোন্‌টি পশুর রক্ত আর কোন্‌টি মানুষের রক্ত! মানুষের রক্ত পশুর রক্তের সঙ্গে মেশালেই সঙ্গে সঙ্গে ছানা কেটে যায়। হিমোগ্লবিন্ ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রক্তের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের **সমস্ত** রক্ত ছানা কেটে যায়। রোগী মারা যায়।

ছানা কাটা বাঁচিয়ে যদি রক্ত দেওয়া যায়, তাহলেই রক্তদানের সফলতা আসবে।

ল্যাণ্ডস্টিনার আবার গবেষণায় বসলেন। মানুষের শরীরে মানুষের রক্তই দিতে হবে। পশুপাখির রক্ত মেশাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের শরীরে অন্য কোন পশুর রক্ত দেওয়া সম্ভব নয়!

—এলিজাবেথ! ল্যাণ্ডস্টিনার-এর ডাকে এলিজাবেথ পাশে দাঁড়াল।

—মানুষের রক্ত কোত্থেকে পাই?

এলিজাবেথ মৃদু হাসল।

ল্যাণ্ডস্টিনার এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন—হাসবার মত কি বললাম?

—মানুষের রক্ত কোত্থেকে পাবেন আমায় জিজ্ঞাসা করছেন? কে দেবে বলুন?

—তুমি দিতে পারো?

—পারি। দৃঢ়চিত্তে এলিজাবেথ জবাব দিল,—আমার রক্তে যদি একটা জীবন বাঁচে নিশ্চয়ই দেব।

—বাঁচবে কি না জানি না, চেষ্টা করতে পারি।

ল্যাণ্ডস্টিনার সিরিঞ্জ ঠিক করে এলিজাবেথের শিরা থেকে

খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে বললেন—এখন অল্প একটু নিলাম। প্রয়োজন হলে বেশী নেব।

একটা শিশির মধ্যে রক্ত রেখে, শিশিটা বরফের মধ্যে রেখে দিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার। গবেষণায় দেখেছেন, রক্ত বরফের মধ্যে রেখে দিলে ঠিক থাকে। সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখলে হিমোগ্লবিন্ গলে যায়। রক্ত নষ্ট হয়ে যায়।

—ও ভাবে রাখলেন কেন? এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল।

—কারণ আছে। পরে বলব।

ক্যাম্পের বাইরে মুমূর্ষুর আর্তনাদ। কাতারে কাতারে আহত সৈনিকদের নিয়ে ট্রাক আসছে। ট্রাকের ওপরই একটা বোমা পড়েছে। চারিদিকে তছনছ হয়ে গেছে ট্রাকগুলো। কিছুসংখ্যক সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিছু তখনও বেঁচে আছে।

ক্যাম্পের দরজার কাছে ল্যাণ্ডস্টিনার দাঁড়ালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস তাঁর বুক চিরে বেরিয়ে এল। যুদ্ধের চেয়ে বড় অভিশাপ বোধহয় মানুষের সমাজে আর নেই।

একটি ছেলের দিকে নজর পড়ল ল্যাণ্ডস্টিনারের। ফরসা ধবধব করছে রঙ। কোঁকড়া কোঁকড়া লাল চুল কপালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পায়ের খানিকটা উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ফরসা মুখখানি।

পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এলিজাবেথ সৈনিকের ওপর। আকুল হয়ে ডাকল—টম্—টম্—।

ক্ষিপ্রগতিতে ল্যাণ্ডস্টিনার ক্ষতস্থান চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কে?

—আমার ছোট ভাই। কাঁদতে কাঁদতে এলিজাবেথ বলল—ও বাঁচবে ডাক্তার?

—বলা মুশকিল। যে পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে; কিছু রক্ত না দিলে বাঁচানো সম্ভব হয়ে না মনে হচ্ছে।

এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে উঠে কঠিনকণ্ঠে বলল—আমার রক্ত দিলে হবে না ?

—পরীক্ষা না করে কিছু বলতে পারছি না। ওকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও।

কাল বিলম্ব না করে এলিজাবেথ এবং ল্যাণ্ডষ্টিনারের সহকারীরা টম্‌কে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। ল্যাণ্ডষ্টিনার টমের শিরা থেকে খানিকটা রক্ত টেনে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

এলিজাবেথের সঞ্চিত রক্ত থেকে খানিকটা রক্ত নিলেন, তারপর টমের রক্তের খানিকটা নিয়ে একটা স্লাইডের ওপর মিশিয়ে দিলেন।

এক মিনিট, দু মিনিট, পাঁচ মিনিট—।

ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রাখছেন ল্যাণ্ডষ্টিনার আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।—আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু কই ছানা তো কাটল না!

তাড়াতাড়ি মাইক্রোস্কোপ বার করে তার নীচে স্লাইডখানি ধরলেন। মাইক্রোস্কোপের ভিতর চোখ রেখে পরিষ্কার দেখতে পেলেন, প্রত্যেকটি লোহিত কণিকা নিখুঁত রয়েছে। একটিও নষ্ট হয়নি। একটিও গলে যায়নি।

ল্যাণ্ডষ্টিনার পাগলের মত বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেই এলিজাবেথকে আদেশ দিলেন—তোমার ভাইয়ের পাশে, তুমি শুয়ে পড়।

বিনা দ্বিধায় এলিজাবেথ আদেশ পালন করল। অন্য ডাক্তাররা বললেন—কি করছেন ডক্টর ল্যাণ্ডষ্টিনার? অপারেশনে দেরি করলে পেশেন্টকে আর বাঁচানো যাবে না।

—ব্লাডপ্রেসার কত ?

—নেই বললেই চলে। রোগীর জ্ঞানও নেই।

—আপনারা অপারেশন স্টার্ট করুন। আমি দেখছি পেশেন্ট-এর ব্লাডপ্রেসার তোলা যায় কি না ?

ডাক্তাররা ল্যাণ্ডষ্টিনারের নির্দেশমত অপারেশন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ল্যাণ্ডষ্টিনার একটি সরু লম্বা রবারের নল নিলেন। নলের দুপাশে দুটি ইনজেকশনের ছুঁচ লাগিয়ে নিলেন। একটি ছুঁচ এলিজাবেথের শিরায় ঢুকিয়ে দিলেন। নলের ভিতর দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। অন্যদিকের ছুঁচটি টমের শিরায় ফুটিয়ে দিলেন। এলিজাবেথের রক্ত রবারের নলের ভিতর দিয়ে টমের দেহের মধ্যে চলে গেল।

ল্যাণ্ডষ্টিনারের হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করে চলছে। যদি শরীরের মধ্যে গিয়ে ছানা কেটে যায়? পালস দেখলেন ল্যাণ্ডষ্টিনার। টমের পালস আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে। ব্লাডপ্রেসার উঠছে।

—পেসেণ্ট কেমন? ল্যাণ্ডস্টিনার অ্যানেস্থেটিস্টকে প্রশ্ন করলেন।

—ভাল। খুব ভাল।

ছুঁচ বার করে নিলেন ল্যাণ্ডস্টিনার। বেশী রক্ত দিলে টমের দুর্বল হৃৎপিণ্ড সহ্য করতে পারবে না। এলিজাবেথও অত্যধিক দুর্বল হয়ে পড়বে।

রক্ত দেওয়া শেষ হয়ে গেল। এলিজাবেথ উঠে বসতে গেল। ল্যাণ্ডস্টিনার বাধা দিয়ে বললেন—উঠো না। মাথা ঘুরতে পারে—।

—কিচ্ছু হবে না। জোরের সঙ্গে মাথা ঝেড়ে এলিজাবেথ উঠে দাঁড়াল। ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন সত্যিই এলিজাবেথ সুস্থ।

টমের একটা পা বাদ দিতে হল, তবু টম সুস্থ হয়ে গেল। যে অপারেশনে এর আগে রোগী বাঁচত না, সেই অপারশনেই টম বেঁচে উঠল।

এলিজাবেথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ল্যাণ্ডস্টিনারকে বলল—ডাক্তার! পৃথিবীর সব সৈনিককে বাঁচাবার জন্যে আমি রক্ত দেব।

মৃদু হেসে ল্যাণ্ডষ্টিনার বললেন—ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

—তার মানে?

—পৃথিবীর সব মানুষের রক্ত এক নয়।

—সে কি! সব রক্তই তো লাল!

—লালের মধ্যেও প্রভেদ আছে।

—আমায় বুঝিয়ে বলুন ডাক্তার।

ল্যাণ্ডস্টিনার ধীর কণ্ঠে বললেন—তোমার রক্তের নাম দিয়েছি 'এক'। তোমার রক্ত আর তোমার ভাইয়ের রক্ত একই রকমের। তোমার ভাইয়ের রক্তও 'এক'-গ্রুপের। কিন্তু আমার রক্তের সঙ্গে তোমার রক্ত মিলবে না। মেশালেই ছানা কেটে যাবে।

—তাহলে? এলিজাবেথের হতাশা মেশানো জিজ্ঞাসা।—আমার রক্ত দরকার হলে টম্ ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না?

—পারবে। পৃথিবীর যত লোকের 'এক'-গ্রুপের রক্ত আছে, তারা সবাই দিতে পারবে।

—কত রকমের রক্তের গ্রুপ আছে?

—চার রকমের। এক, দুই, তিন, চার। পৃথিবীর সমস্ত লোক এই চার ধরনের রক্ত বহন করছে।

—কিন্তু এত লোকের রক্ত পাবেন কি করে?

—সেই ব্যবস্থাই আমাকে করতে হবে। চিন্তিত মুখে ল্যাণ্ডস্টিনার বললেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি যত বেড়ে চলল, ল্যাণ্ডস্টিনারের গবেষণাও তত পুরোদমে চলতে লাগল। ল্যাণ্ডস্টিনার পাশাপাশি শুইয়ে অনেক রক্ত নিয়েছেন, কিন্তু তাতে ঠিক মন সায় দিচ্ছে না। এ প্রথা বৈজ্ঞানিক প্রথা নয়। রক্ত সংগ্রহ করে বোতলে যদি রাখা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে একটি হিসেব অনুযায়ী রক্ত দেওয়া যেতে পারে।

কি করে বোতলে রাখা যায়?

শরীরের বাইরে রক্ত এলেই জমাট বেঁধে যায়। রক্ত জমাট বেঁধে গেলে শ্বেতকণিকা লোহিতকণিকা জড়াজড়ি করে নষ্ট হয়ে যায়, আর জলীয় ভাগটা জলের আকারে গড়িয়ে আলাদা হয়ে যায়।

রক্তকে তরল করে রাখতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দিনের পর দিন গবেষণা করে চলেছেন ল্যাণ্ডস্টিনার। রক্তের মধ্যে কি আছে? কেন শরীরের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে না? হিমোগ্লবিন্ কী করে শরীরের মধ্যে অটুট থাকে?

গবেষণা! গবেষণা!

কিছুতেই সুরাহা করতে পারেন না ল্যাণ্ডস্টিনার। শরীরের বাইরে রক্ত সঞ্চিত করে রাখা যায় কি করে?

দীর্ঘ দিন গবেষণার পর দেখা গেল সোডিয়াম সাইট্রেট আর গ্লুকোজ মিশ্রিত জলের মধ্যে যদি রক্ত সঞ্চিত করে রাখা হয়, তাহলে আর রক্ত জমাট বাঁধে না। শুধু তাই নয়। রক্ত সঞ্চিত করে বোতলগুলি রাখতে হবে অত্যন্ত ঠাণ্ডার মধ্যে, যে জায়গার উত্তাপ দু থেকে চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকবে। ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে থরে থরে রক্তের বোতল জমা হতে লাগল। আহত সৈনিকের দল, যারা রক্তের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত, তারা নিশ্চিতভাবে প্রাণ ফিরে পেতে লাগল। শুরু হল শল্য-চিকিৎসার নতুন অধ্যায়। অনেক দুরূহ অপারেশন, যা অত্যধিক রক্তক্ষয়ের ভয়ে পরিত্যাগ করা হত, তা অনায়াসে সাফল্য লাভ করল।

ল্যাণ্ডস্টিনারের মুখের ওপর আবার দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। অন্যান্য চিকিৎসকরা যখন সমস্যার সমাধান হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্ত, ল্যাণ্ডস্টিনার আবার চিন্তার রাজ্যে ডুবে গেলেন।

সঞ্চিত রক্তের বোতলগুলি কিছুদিন রাখার পর নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। হিমোগ্লবিন্ নষ্ট হয়ে লোহিতকণিকা থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত রক্তের মধ্যে মিশে গেল। বোতলের রক্ত অকেজো হয়ে গেল।

কেন? এবার তো রক্ত জমাট বাঁধেনি। ঠাণ্ডাও তো ঠিকই আছে। তাহলে? রক্ত সঞ্চিত করে রাখার জন্য তাহলে আরও কিছু পদার্থের প্রয়োজন?

গবেষণা আবার শুরু হল। ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন লোহিতকণিকা তিন সপ্তাহ থেকে তিন মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকে। মানুষের শরীরের

মধ্যেও লোহিতকণিকার মৃত্যু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন লোহিত-কণিকার জন্ম হয়। মৃত লোহিতকণিকার অপ্রয়োজনীয় অংশ দেহের বাইরে চলে যায়, প্রয়োজনীয় অংশ নতুন লোহিতকণিকা সৃষ্টির কাজে লাগে। এই জন্মমৃত্যু শরীরের মধ্যে অহরহ ঘটছে। একে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই।

ল্যাণ্ডস্টিনার দেখলেন বোতলের মধ্যে রক্ত নিখুঁত থাকে চোদ্দ দিন। চোদ্দ দিনের পর থেকে লোহিতকণিকার মৃত্যু শুরু হয়। লোহিতকণিকার মৃত্যু হলেই হিমোগ্লবিন্ লোহিতকণিকা থেকে বেরিয়ে আসে। শরীরের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হিমোগ্লবিন্‌কে সরিয়ে নেওয়া হয়, বোতলের মধ্যে সে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হবার সম্ভবনা নেই। তাই দূষিত হিমোগ্লবিন্ বোতলের সমস্ত রক্তকে নষ্ট করে ফেলে।

সব দিক চিন্তা করে, সমস্ত অনুসন্ধানের পর ল্যাণ্ডস্টিনার সাব্যস্ত করলেন রক্ত সংগ্রহের দিন থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রক্ত ব্যবহার করতে হবে। যদি না হয়, তাহলে সেই বোতলকে বাতিল করে দেওয়া হবে।

পৃথিবীর দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হল প্রত্যেক হাসপাতালের সঙ্গে। রক্ত দানের সঙ্গে চিকিৎসা জগতের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। শল্য-চিকিৎসার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হল।

পুরনো দিনের রক্ত-গ্রুপকে নতুনভাবে নামকরণ করা হল। পৃথিবীর সব দেশই বর্তমান নামকরণ স্বীকার করে নিলেন।

পুরনো দিনের 'এক' এর নতুন নামকরণ হল 'এ বি' গ্রুপ, 'দুই' এর নাম হল 'এ', 'তিন', হল 'বি' আর 'চার' হল 'ও'।

তবু সমস্যা রয়ে গেল। নিখুঁত রক্ত দিয়েও দেখা হল অনেক সময়ে রোগী বা রোগিণীর নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক

সময়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। কেন? আবার গবেষণা শুরু করলেন বৃদ্ধ ল্যাণ্ডষ্টিনার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে গেছে। পৃথিবীতে আবার সন্ধির পতাকা উড়েছে, কিন্তু যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ল্যাণ্ডস্টনার, তার শেষ হয়নি। আবার নতুনভাবে যুদ্ধ করতে বসলেন ল্যাণ্ডস্টনার।

ঠিক আছে তো সব কিছুই। রক্তের গ্রুপ ঠিক আছে। সঞ্চিত রক্তেও কোন দোষ নেই। যে রোগীকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে, তার রক্তেও কোন দোষ নেই। তবে কেন গোলমাল হচ্ছে? যদিও এই প্রতিক্রিয়া ক্বচিৎ কদাচিৎ। তবুও কেন হবে? কেন নিশ্চিন্তভাবে রক্ত দেওয়া যাবে না?

না। গ্রুপের মধ্যে কোথাও গোলমাল নেই। বার বার পরীক্ষা করে দেখলেন ল্যাণ্ডস্টিনার, কিন্তু কোন দোষত্রুটি পেলেন না কোথাও। তাহলে কি রক্তের মধ্যে আরও কিছু আছে?

বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি ল্যাণ্ডস্টিনারের মস্তিষ্কে। নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে।

গবেষণা শুরু করলেন। যে সব বোতলের রক্ত দিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটছে, সেই সব বোতলের লেবেল থেকে রক্ত দাতাদের নাম খুঁজে বার করলেন। তাঁদের রক্ত আবার পৃথক্‌ভাবে সংগ্রহ করে গবেষণা শুরু করলেন।

আশ্চর্য!

গবেষণা করতে করতে ডাক্তার দেখলেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রক্ত দু'ভাগে ভাগ করা চলে। শতকরা পঁচাশি জন মানুষ একদিকে, আর শতকরা পনেরো জন আর একদিকে। শতকরা পনেরো জন যে পক্ষে তাদের রক্তের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। একই গ্রুপের রক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের রক্তের বৈচিত্র্য পৃথক ধরনের। এদের রক্ত, শতকরা পঁচাশি জনের রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না। এদের রক্তকে বলা হয় রেশাস্ নেগেটিভ্। শতকরা পঁচাশি জন যে ধরনের রক্ত

বহন করছে, তার নাম দেওয়া হল রেশাস্ পজিটিভ্। রেশাস্ নেগেটিভ্ রক্ত রেশাস্ পজিটিভ্ রক্তের সঙ্গে কোনদিন খাপ খাবে না; একই গ্রুপের রক্ত হওয়া সত্ত্বেও।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সংগ্রহের ইতিহাস বদলে গেল। আধুনিকতম সরঞ্জাম তৈরি হল রক্ত সঞ্চয় করে রাখার জন্য। জলীয় রক্তকে শুকিয়ে 'শুকনো রক্ত' তৈরি করা হল। শুকনো রক্ত যে কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এর জন্য ঠাণ্ডা ঘরের প্রয়োজন হয় না। দূর গ্রামে বা অরণ্যের মাঝখানেও মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচাবার জন্য শুকনো রক্ত অনায়াসে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। দেবার সময় শুধু জল মিশিয়ে নিলেই স্বাভাবিক রক্তের মতই শিরায় প্রবেশ করানো যায়।

ল্যাণ্ডস্টিনার চিকিৎসার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন রক্ত দানের ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রথায় গড়ে তোলার জন্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীর বুকে অনেক অভিশাপ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু রক্ত-চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করে দেবার জন্যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশীর্বাদ চিরকাল বহন করবে।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ তের

আশ্চর্য!

কে জানতো এই বিশ্রী পদার্থ একদিন পৃথিবীতে সোনার চেয়েও আদরণীয় হয়ে উঠবে।

পারস্য দেশের মানুষ ভাবতো, ভগবান তাদের সহায়। তাদের পূজনীয় দেবতা হল আগুন। পারস্য দেশের নানা জায়গায় এরা আগুন জ্বালতো, আর আগুনের সামনে বসে দেবতার পুজো করত। আশ্চর্য ব্যাপার। দেবতা তাদের ছাড়তে চান না। একবার আগুন জ্বাললে, সে আগুন আর নেবে না। গাঁয়ের মানুষ তাকে বলে শাশ্বত-আগুন।

অগ্নিদেবতা পারস্যের মানুষকে আরও সাহায্য করেন। পারস্যের বিরুদ্ধে যখন কোন দেশের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন মাটি ফেটে একরকমের কালো ঘন কালি বেরিয়ে আসে। সেই ঘন কালি তীরের মুখে মাখিয়ে নিয়ে মশালের মত তৈরি করে, ধনুকে লাগিয়ে দূরে ছুঁড়ে মারত। আশ্চর্যের বিষয়, তীরবেগে শর নিক্ষেপ করলেও মশালের আগুন নিবতো না। উড়ন্ত আগুন তীরের ফলায় এসে কুঁড়েঘরগুলোর ছাদে আগুন লাগিয়ে দিত। গ্রামবাসীরা ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতো। শত্রুপক্ষ অবাক হয়ে দেখতো, এ কেমন তীর? তীরের ফলায় বিষ মেশানো যায়, কিন্তু আগুন মেশায় কী করে? গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়, শত্রুপক্ষরা এঁটে উঠতে পারে না, অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়।

পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বে গ্রীসে হেরোডোটাস নামক একজন ঐতিহাসিক পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন, পারস্য দেশের অধিবাসীরা ডোবাখানা থেকে এক রকমের ঘন কালি তুলে আনে। এই কালি দেখতে খুব কালো এবং চটচটে। গন্ধ খুব বিশ্রী। এই কালি এরা ঘর তৈরির কাজে লাগায়। আঠার মত কালি দিয়ে ঘরের বেড়া জোড়া লাগাতো।

ভেনিসের বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের সম্রাট কুবলাই খাঁয়ের সভায় বেড়াতে যান। সেখানে যাবার সময় বাকু অঞ্চলে তিনি এক রকমের আশ্চর্য ধরনের ঝরনা দেখতে পান। এ ঝরনা দিয়ে জল বার হয় না, তেল বার হয়। এই

তেল খাবার উপযোগী নয়, তবে জ্বালানির জন্যে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই তেলের বিষয় আরও খোঁজ শুরু হয় আমেরিকায়। উত্তর আমেরিকার বহু অঞ্চলে জলের ওপর এক ধরনের তেল ভাসতে দেখা যেত। রেড ইণ্ডিয়ানরা এই তেল মেশানো জল গায়ে মাখতো বাত ধরনের রোগ সারাবার জন্যে। অনেকে আবার এই তেল মেশানো জল ওষুধ হিসেবে নানা রোগে খেত।

ইউরোপ থেকে যখন আমেরিকায় অধিবাসীরা উপনিবেশ পত্তন শুরু করলেন, তখন তাঁরাও রেড ইণ্ডিয়ানদের দেখাদেখি গায়ে তেল মেশানো জল মালিশ করতেন, এবং দেখা গেল, তাতে চামড়া বেশ টানটান হয়। এই তেল মেশানো জলকে বলা হত সেনেকা তেল অথবা ইণ্ডিয়ান অয়েল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার লোকেরা নোনতা জল ব্যবহারের জন্য কূপ খুঁড়ে আশ্চর্যভাবে দেখল জলের সঙ্গে তেলের মিশ্রণ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, কারণ এই তেল মেশানো বিশ্রী গন্ধের জল ব্যবহারের যোগ্য নয়। সকলেই রেগে-মেগে কূপগুলো আবার বুজিয়ে দিল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোভা স্কোটিয়া অধিবাসী ডক্টর অ্যাব্রাহাম গেস্‌নার কয়লা থেকে জ্বালানি আবিষ্কার করেন। অ্যাব্রাহাম গেস্‌নার এই তেলের নাম দিলেন কেরোসিন। গ্রীক শব্দ কেরাস (Keras) মানে হল মোম (Wax)। মোমবাতি যেমন অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে, কেরোসিন তেলের আলোও অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। সেইজন্যে এই তেলের নাম দিলেন কেরোসিন। এই সময়ে একটি কোম্পানী তৈরি করা হল, যে কোম্পানী এই তেল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই কয়লা-তেল থেকে আরও সুন্দর ধরনের তেল আবিষ্কার করার জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করলেন।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনসিলভানিয়ার অয়েল ক্রিক-এর অধ্যাপক

বেনজামিন সিলিম্যান, যিনি ইয়েল কলেজের অধ্যাপক, তিনি আবিষ্কার করলেন আর এক রকমের তেল, যে তেলের জ্বালানি শক্তি কয়লা এবং কেরোসিনের চেয়েও বেশি এবং সুন্দর।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই তেল ভীষণভাবে দাহ্য। আগুনের কাছাকাছি নিয়ে গেলেই দপ করে জ্বলে ওঠে এবং সে আগুন সহজে নেবানো যায় না।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই তেলের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ থেকে আটানব্বুই ভাগ হাইড্রোকারবন আছে, বাকী অংশ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অথবা গন্ধক জাতীয় জৈব পদার্থ বিদ্যমান।

এ তেল এল কোথা থেকে? কী ভাবে?

আবার গবেষণা।

গবেষণার সূত্র থেকে আশ্চর্য ধরনের ব্যাখ্যা তৈরি করলেন বিশেষজ্ঞগণ। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণী এবং লতাগুল্ম সমুদ্রের তলায় জমা হয়ে থাকে। এই প্রাণী এবং ভেষজ উদ্ভিদ মৃত অবস্থায় জমা হয়ে পড়লে, তার ওপর ক্রমশঃ বালি, মাটি, পাথর প্রভৃতি চাপা পড়ে। এমনিভাবে প্রাণীজ এবং উদ্ভিদজাত অংশগুলি পৃথিবীর চাপে এবং উষ্ণতায় বিবর্তিত হতে থাকে। সেই বিবর্তন থেকে ক্রমশঃ মৃত প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে মাটির তলায় গ্যাস তৈরি হয়, যাকে বলে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) আর তৈরি হয় দহনীয় তেল যার বৈজ্ঞানিক নাম পেট্রোলিয়াম।

অনেক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে যথেষ্ট হাইড্রোকারবন আছে। সেগুলি মৃত্যুর পর অক্সিজেন এবং অন্যান্য পদার্থের প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ামে পরিবর্তিত হয়, অবশ্য সেজন্যে পৃথিবীর উপরিভাগের চাপ এবং উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

পেট্রল সাধারণতঃ জল ও গ্যাসের সঙ্গে একসঙ্গে থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে থাকে স্তরীভূত প্রস্তর। তার নীচের স্তরে

থাকে গ্যাস, তার তলায় পেট্রল থাকে, তার নীচে জল এবং তার নীচে আবার স্তরীভূত প্রস্তর।

যখন পেট্রলের সন্ধানে গর্ত খোঁড়া হয় তখন গর্ত স্তরীভূত প্রস্তর স্তর ভেদ করে গ্যাসের স্তরে পৌঁছায়। যে মুহূর্তে গর্ত গ্যাসের স্তরে পৌঁছায়, সেই মুহূর্তে গ্যাসের চাপে পেট্রল ফোয়ারার মত উপরে উঠে আসে। ভূতত্ত্ববিদেরা কোথায় পেট্রল সঞ্চিত আছে, এ নিয়ে সদাসর্বদা গবেষণা করছেন। ওঁদের এক রকমের যন্ত্র আছে, যার নাম সেস্‌মোগ্রাফ্। এই যন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ভূত্বকের বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা হয়ে যায় আর তাইতে বোঝা যায় মাটির নীচে কী ধরনের প্রস্তর আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা আগে ডিনামাইট ফাটিয়ে ছোটখাটো একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেন, সঙ্গে সঙ্গে সেস্‌মোগ্রাফ মেলে ধরেন। পৃথিবীর উপরিভাগ এবং মধ্যেরও কিছু ভাগ কম্পিত হয়ে ওঠে এই কৃত্রিম ভূমিকম্পে। বিভিন্ন প্রস্তরের কম্পন বিভিন্নভাবে ফুটে ওঠে সেস্‌মোগ্রাফে। কম্পিত প্রস্তরের কম্পন-চিত্র সেস্‌মোগ্রাফে ফুটে ওঠে আর সেই কম্পিত চিত্র দেখে বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পারেন প্রস্তর স্তরের নীচে পেট্রল আছে কি নেই।

স্থান নির্বাচনের পর খোঁড়ার আয়োজন শুরু হয়। যে স্থান পেট্রল অন্বেষণের জন্য নির্বাচিত হয়, সে স্থানে প্রথমে একটা বিরাট প্লাটফর্ম করা হয়। প্লাটফর্মের প্রান্তে একটি উঁচু ক্রেন্ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর উঁচু ক্রেন থেকে ড্রিল লাগিয়ে দেওয়া হয়। ড্রিল একটা পাইপের মধ্যে পরিয়ে চালু করা হয়। ড্রিল ঘুরে ঘুরে মাটি খুঁড়ে মাটির মধ্যে ঢুকে যায়, ড্রিলের সঙ্গে পাইপও মাটির মধ্যে ঢুকে যায়। ড্রিল পাথর কেটে কেটে যত গভীরে ঢুকে যায়, পাইপও ক্রমশঃ মাটির তলায় ঢুকে যায়। যখন পাইপ পুরো মাটির তলায় ঢুকে যায়, তখন পাইপের মাথায় নতুন পাইপ লাগিয়ে লম্বা করা হয়। এইভাবে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে যখন ড্রিল সমেত পাইপ পেট্রলের স্তরে পৌঁছায়, তখন পাইপকে যথাস্থানে রেখে ভেতর

থেকে ড্রিল তুলে নেওয়া হয়। পেট্রল স্তর থেকে প্রথমে পেট্রল মেশানো কাদা ওঠে। পাম্প করে পেট্রলের কাদা তুলে গর্তের আশেপাশেই ফেলা হয়। আলকাতরার মত পদার্থ গর্তের আশেপাশে ঢুকে গিয়ে সমস্ত ফুটোগুলো বন্ধ করে দেয় এবং শুধু পাইপ দিয়েই পেট্রলজাত পদার্থ ওপরে ওঠে। এ ছাড়াও ভাল স্টীলের পাইপ কেসিং হিসেবে পাইপের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পাম্প করে যে পেট্রল মাটির নীচ থেকে তোলা হয়, তাকে বলা হয় অপরিশোধিত বা ক্রুড পেট্রোলিয়াম।

অপরিশোধিত পেট্রলকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয়। এই রাসায়নিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিস্টিলেশন। ডিস্টিলেশন প্রসেস খুব জটিল পদ্ধতি, তবে সহজভাবে বলা যায় এই অপরিশোধিত তেলকে গরম করে বাষ্পীভূত করা হয়, তারপর ঠাণ্ডা করে পরিশুদ্ধ তেল পৃথক করা হয়।

পেট্রল পরিশুদ্ধিকরণের মুশকিল হল, কোন পেট্রলজাত তেল সত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইটেই গরম হয়ে যায় আবার কোন কোন পেট্রল তেল গরম হতে লাগে ছ'শ ডিগ্রী ফারেনহাইট। সেইজন্যে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করা হয় পাইপের দ্বারা। লম্বা পাইপের একদিকে অপরিশোধিত তেল ঢেলে দেওয়া হয়। পাইপের মধ্যে ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছ'শ পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়। এই উত্তাপের ভেতর দিয়ে অপরিশোধিত তেল যেতে যেতে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থে রূপান্তরিত হয়। যখন সবচেয়ে বেশি গরম হয়ে যায়, তখন ঠাণ্ডা করে পরিশুদ্ধ তেল বার করে নেওয়া হয়।

পেট্রল থেকে বহু পদার্থের সৃষ্টি হয়। কোন পদার্থ তৈরি করতে প্রত্যক্ষভাবে, কোন পদার্থে পরোক্ষভাবে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন হয়।

যে পেট্রলে মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ট্রাকটর প্রভৃতি চলে

তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যাসোলিন। অপরিশোধিত পেট্রলের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ ব্যবহৃত হয় গ্যাসোলিন তৈরির জন্য।

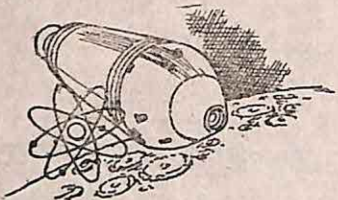
কেরোসিন তেলও তৈরি হয় অপরিশোধিত পেট্রল থেকে। যত পেট্রল পাওয়া যায়, তার শতকরা তেত্রিশ ভাগ ব্যবহৃত হয় কেরোসিন তৈরির জন্যে।

অপরিশোধিত পেট্রল থেকে ডিজেল পাওয়া যায়, যা দিয়ে বর্তমানে মোটর গাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি চলছে।

এ ছাড়াও বাড়িতে আলো জ্বালার জন্যে অপরিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয় আর সবচেয়ে অপরিশুদ্ধ কাদা কাদা তৈলাক্ত পদার্থ দিয়ে মেশিনে লাগিয়ে হড়হড়ে করা হয়। গ্রীজ দিয়ে মেশিন চালালে মেশিনের ক্ষতি হয় না এবং অনেকদিন টেঁকে।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার ছাড়াও পেট্রোলিয়ামের পরোক্ষ ব্যবহার অসংখ্য পদার্থে প্রয়োজন হয়, যা বলে শেষ করা যায় না।

পেট্রল থেকে বহু রকমের পদার্থ আবিষ্কার মানুষ করেছে, কিন্তু পেট্রল কীভাবে তৈরি করতে হয়, তা এখনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। প্রকৃতির কৃপায় যে সমস্ত দেশে পেট্রলের খনি আছে, সেই সমস্ত দেশ প্রকৃতির দানে ধনী হয়ে অন্য দেশকে নানাভাবে ভয় দেখাচ্ছে। পেট্রলের খনি ফুরিয়ে গেলেই তারাও আবার গরিব হয়ে যাবে, এ কথা না ভেবেই প্রকৃতির দানকে মানুষের আবিষ্কার ভেবে গর্বভরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।



আবিষ্কারের কাহিনী ॥ চোদ্দ

১৬ই জুলাই। ১৯৪৫ সাল। শেষ রাত্রি। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন নিউ মেক্সিকোর অ্যালামোগর্দা এয়ার বেস-এর সৈন্যদল। মরুভূমির প্রান্তে এই বিমানকেন্দ্র। সামনে মরুভূমির ধুধু প্রান্তর। ছ' মাইল দূরে একটি ইস্পাতের গম্বুজের ওপর বসানো রয়েছে একটি নতুন ধরনের বোমা। এ বোমা নাকি পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে।

জিততেই হবে! প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাতির উদ্দেশ্যে দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছেন ; যে ভাবেই হোক আমাদের জিততেই হবে। জার্মান বা জাপানের কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করব না।

বৈজ্ঞানিকের দল প্রতিজ্ঞা করেছেন—জাতির সম্মান, দেশের সম্মান বাঁচাতেই হবে। এর আগেও যখনই দেশের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই তার সমাধান করেছেন। মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর রবার পাওয়া যায়। জাপানীরা ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় অধিকার করে নিলেন, সঙ্গে ইউরোপের বাজার থেকে রবার একেবারে উবে গেল। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের দল সকলকে ভরসা দিয়ে বললেন—কোন ভয় নেই, আমরা রবারের মত জিনিস ল্যাবোরেটরীতে তৈরি করে দিচ্ছি। তাঁরা কথা রাখলেন।

দেখতে দেখতে দেখতে নিয়োপ্রিন থায়োকল, বুটিল, বুনা, বুনা এস প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম (সিন্থেটিক) রবার তৈরি করে বাজারে ছাড়লেন। এত তৈরি করে দিলেন যে শুধু আমেরিকা নয়, মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশই এই রবার ব্যবহার করতে শুরু করলেন।

ঠিক তেমনি জার্মানীতে পেট্রলের অভাব দেখা দিল মারাত্মক রকমের। জার্মানীতে পেট্রল নেই। পেট্রল পাওয়া যায় যে সব দেশে, সবগুলিই মিত্রপক্ষের কবলে। পেট্রলের সংকট ঘোচাবার জন্য জার্মানীর বিজ্ঞানীরা গবেষণায় বসে গেলেন। দিনরাত গবেষণা করে কয়লা এবং লিগনাইট থেকে কৃত্রিম তেল তৈরি করে ফেললেন। যুদ্ধের সময় জার্মানের অর্ধেকের চেয়ে বেশি পেট্রলের চাহিদা এই কৃত্রিম তেল মিটিয়েছে।

দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানপোত তৈরি করে জার্মান এত বলশালী হয়ে গেল যে বোমায় বোমায় মিত্রপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফেলল। সমস্ত বৃটেন জার্মানীর উন্নত ধরনের বিমানবাহী বোমার আঘাতে থরহরিকম্প। বোমার আঘাতে আঘাতে লণ্ডন শহরকে ধূলিসাৎ করে দেবার মনস্থ করেছেন হের হিটলার। চার্চিল নীরব নিথর। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ট্রুম্যান খাঁচায় বন্দী সিংহের মত গর্জন করছেন আর বলছেন—বোমা চাই। এমন বোমা, যে সমস্ত জার্মান আর জাপান বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিকের দল নীরবে এবং গোপনে গবেষণা করে গেছেন। তাঁদের গবেষণার কথা সাধারণের কেউ জানে না। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই বৈজ্ঞানিকদলের নেতা বললেন—আমরা প্রস্তুত।

ট্রুম্যান আদেশ দিলেন—প্রথম পরীক্ষা করা হবে নিউ মেক্সিকোর মরুপ্রান্তে। সৈন্যের দল অ্যাটেনশন্ হয়ে রইল এয়ার-বেস-এ। দূরে—ছ মাইল দূরে—একটি ইস্পাতের গম্বুজের ওপর সেই নবাবিষ্কৃত বোমাটি।

—ফায়ার! আদেশ দিলেন সেনাপতি।

মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার সূর্য একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কয়েক হাজার বিদ্যুৎ যেন একসঙ্গে ঝলকে উঠল। দেখতে দেখতে নানা-রকমের রঙ চোখের সামনে খেলা করতে লাগল। সোনালী, লাল, বেগুনে, ধূসর নীল। তিরিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বিকট আওয়াজ আর উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ। যাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে বোমা ফাটানো দেখছিলেন, তাঁরা বিদ্যুতের ঝলকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন। সকলের মনে হল, তাঁরা এক নতুন যুগের সূচনামুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

না—না। আমার কথা নয়। প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস এফ ফ্যারেল এই ভয়ংকর বোমার বর্ণনা লিখেছেন।

নতুন নতুন সূচনা হল। নতুন বোমার নাম হল অ্যাটমিক বোম। সমস্ত মানুষের মনে হল তারা যেন এক নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সকাল সাড়ে দশটায় আমেরিকার বৈমানিক জাপানের সৈন্যশিবির হিরোসিমার ওপর একটি অ্যাটমিক বোমা নিক্ষেপ করেছে।

এই বোমার শক্তি দু হাজার টি. এন. টি বোমার চেয়েও শক্তিশালী। এই বোমার নাম অ্যাটমিক বোমা।

আবার এই মারাত্মক বোমা পড়ল নাগাসাকির ওপর। আতঙ্কে শিউরে উঠল পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। এই ভাবে যদি একটির পর একটি বোমা পড়তে থাকে, সমস্ত পৃথিবী অল্পদিনের মধ্যেই জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হবে।

জাপান-জার্মান পরাজয় স্বীকার করল। অভিশপ্ত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান ঘটল।

আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন ম্যাটার এবং এনার্জি একই পদার্থ এবং একটি থেকে আর একটিতে রূপান্তরিত সম্ভব। আইনস্টাইনের ইকোয়েশন ফিজিকস্-এর ছাত্রছাত্রীরা ভাল করেই জানে। লিখলে এই রকম দাঁড়ায়।

$E = mc^2$

E—Energy, m—mass, c—velocity of light (186, 280 miles per second).

এই অঙ্কের মধ্যেই নিহিত ছিল বিশ্ববিখ্যাত ইঙ্গিত। এর মধ্যে বলা আছে, অতি অল্প পরিমাণের বস্তুকে কল্পনাতীত শক্তিশালী এনার্জিতে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

ইটালীয়ান পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি (১৯০১-৫৪) চেষ্টা করতে লাগলেন, নিউট্রনগুলোকে সাবঅ্যাটমিক বুলেট হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি করে ? তিনি নিউট্রনগুলোকে প্যারাফিনের ভেতর দিয়ে বাহিত করে দেখলেন নিউট্রনগুলো ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। প্যারাফিনের মত অন্য কোন কার্বনজনিত পদার্থের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলেও একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। কঠিন জল (Hard water)-ও এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলা হয় মডারেটর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানে বসবাসকারী ইহুদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। হের হিটলার কোন ইহুদীকে রেহাই দেবেন না। নাজী সৈন্যরা ইহুদী পেলেই নিধন করেন অথবা নির্বাসিত করেন।

লাইস্ মিটনার (Lise Meitner) একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদী বৈজ্ঞানিক। তিনি পদার্থবিশারদ। তিনি নাজীদের অত্যাচারে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। কি করবেন তিনি ? এখানে থাকলে নির্ঘাত নাজীসৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। বিজ্ঞানী বলে কোন সম্মানই দেবে না। যাট বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী লাইস্ সকলের অগোচরে গোপনে কোপনহেগেন-এ পালিয়ে গেলেন।

জার্মানিতে দুজন বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিশারদ ওটো হান এবং এফ্ স্ট্রস্ম্যান (Otto Hahn and F. Strassman) মন্থর নিউট্রন ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণে ব্যবহার করতেন। কোপনহেগনে

পালিয়ে যাবার আগে লাইস্ এঁদের সঙ্গে গবেষণা করতেন। এঁরা যখন গবেষণার পরীক্ষা করতেন, অবাক্ হয়ে দেখতেন, বিস্ফোরণের পর ইউরেনিয়ামের অধিকাংশই পুড়ে ছাই হয়ে বেরিয়াম-এ পরিণত হত। বেরিয়াম ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক হালকা।

লাইস্ যখন কোপন্‌হেগেন-এ পালিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন আরও তুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের নাম ফ্রলেন মিটনার আর ও. আর. ফ্রিস্ক্। (Fraulen Meitner and O. R. Frisch). লাইস্ মিটনার ১৯৩৯ সালে ১৭ই জানুয়ারী নেচার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। সেই প্রবন্ধে লিখলেন মন্থর নিউট্রন যখন ইউরেনিয়ামের সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়, তখন ছাই হিসেবে পড়ে থাকে বেরিয়াম। বেরিয়ামের অংশই বেশী। এই প্রবন্ধ পাঠ করে ফ্রলেন এবং ফ্রিস্ক্ আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে তাঁরা ঘোষণা করলেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস যখন নিউট্রনের সহযোগে বিস্ফোরিত হয়, তখন তুটি প্রায় একই মাপের নিউক্লিয়াসে ভেঙে যায়। তারই একটির নাম বেরিয়াম পরমাণু; নিউক্লিয়াস ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়ার নাম দিলেন অ্যাটমিক ফিসন্ (Atomic fission).

ফ্রলেন এবং ফ্রিস্ক্ তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বিখ্যাত ড্যানিশ পদার্থবিদ্যাবিশারদ নীলস্ বোর্-এর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেন। নিলস্ বোর্ ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আমেরিকা যান। সেখানে তিনি অনেক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করেন। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় লক্ষ্য করেন, ইউরেনিয়াম পরমাণু যখন নিউট্রন-এর নিউক্লিয়াসের মধ্যে মিশে যায়, তখন বিস্ফোরণে নিউক্লিয়াসটি টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়াম, ক্রিপ্‌টন্ (Barium and Krypton) এবং আরও অজ্ঞাত পদার্থে পরিণত হয়। এই অজ্ঞাত বস্তু আরও টুকরো হয়ে, পারমাণিক বুলেটে পরিণত হয় এবং

আরও অধিক সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এই রকম পদ্ধতিতে দেখা গেছে, পরপর অনেকগুলো বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। একটি পরমাণুর পর, আর একটি পরমাণুর বিস্ফোরণ মাত্র কয়েক পল অনুপলের মধ্যেই ঘটতে পারে। জার্মান এবং ফরাসী বৈজ্ঞানিকরাও পরীক্ষা করে দেখলেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক কোটি পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষের দিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি কমিশন গঠিত করলেন। এই কমিশনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল যে, এই পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুদ্ধের কোন কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা বিচার করবার। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন, তাতে মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ। এই পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সামরিক বিভাগ এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করল এবং মেজর জেনারেল লেসলি আর গ্রোভার এই বিভাগের দায়িত্ব নিলেন। পারমাণবিক বোমার গবেষণা নিয়মিতভাবে চলতে লাগল, কিন্তু খুব গোপনে কোন সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে যাতে ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রইলেন সামরিক বিভাগ। তারপর সাধারণ মানুষ একেবারে জানতে পারল ট্রুম্যানের ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টেরে ঘোষণার পর। এর পরই প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হেন্‌রী ডি. স্মিথ্ অ্যাটম বোমা তৈরির পদ্ধতি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অ্যাটমিক এনার্জি ফর মিলিটারী পারপাস্ প্রকাশ করলেন।

অভিশপ্ত যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল। পৃথিবীর বুকে আবার শান্তি নেমে এল, কিন্তু বিজ্ঞানীর দল অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলেন। এ কি হল? এমন মারণাস্ত্র তৈরি হল যার শক্তিতে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

এই অমিতশক্তিকে কি কল্যাণকর কাজে লাগানো যাবে না?

তৈরি হল নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর গবেষণা। পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে লাগানো যেতে পারে, একথা বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করলেন। পরমাণু বিস্ফোরণে যে গতির সৃষ্টি হয়, তা দিয়ে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন জাহাজ, এরোপ্লেন তৈরি করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে তৈরি হল মহাকাশযান। প্রথম যুগের মহাকাশ-যানের চেয়ে এখন আরও ভাল ভাল মহাকাশযান তৈরি হচ্ছে। এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাতায়াত করা অনেক সহজ হয়ে গেছে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কল্যাণে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। আগে যে সব রোগের কারণ অজানা ছিল, রেডিও-অ্যাক্টিভ্ আইসোটোপের জন্য অতি সহজেই বোঝা যায়। গাছের সবুজ রঙ কি ভাবে তৈরি হয়, সেই ফটোসিন্থেসিস-এর প্রক্রিয়া রেডিও-অ্যাকটিভ্ আইসোটোপের কল্যাণে জানা গেছে। রেডিও-অ্যাকটিভ্ কোবাল্টের সাহায্যে ক্যানসারে মত দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পরমাণুর ব্যবহারে পৃথিবীর চেহারা আরও সুন্দর আরও সুন্দর আরও গতিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

একদিন যা অভিশাপ ছিল পৃথিবীর কাছে। আজ তাই আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিকদের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়।